স্বাধীনতা

সপ্তম খণ্ড

সম্মুখ সমরের যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

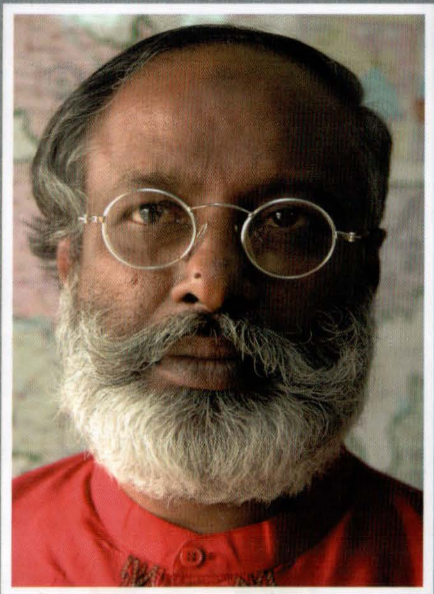
সম্পাদিত



স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

সম্মুখ
সমরের
যোদ্ধাদের
অভিজ্ঞতা

ভূঁইয়া

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৭

স্বাধীনতা (সপ্তম খণ্ড)
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

প্রকাশক

CENTRE FOR BANGLADESH LIBERATION WAR STUDIES

সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন # ০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws1971@yahoo.com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

U.K Distributor ☐ **Sangeeta Limited,** 22 Brick Lane, London
U.S.A Distributor ☐ **Muktadhara,** 37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372
Canada Distributor ☐ **Anyamela,** 300 Danforth Ave., Toronto (1st floor) suite-202
Kolkata Distributor ☐ **Naya Udyog,** 206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

মূল্য : একশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র

Shadhinata (Volume-7) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan. Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, (Ground Floor) House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Desing by Dhrubo Esh. Price Taka : 175.00 Only US # 6

ISBN 984 70008 0031 2

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন

সূচি

১. আখাউড়া এলাকার কয়েকটি যুদ্ধ / ৯
মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

২. কুমিল্লা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা / ২৩
গোলাম মুস্তাফা

৩. মুহূর্তেই ধ্বংস হলো রেলগাড়ি / ৩১
এ কে এম জয়নুল আবেদিন খান, বীর প্রতীক

৪. দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই / ৩৪
মেজর তাহের আহমেদ (অব.) বীর প্রতীক

৫. নকশি বিওপি আক্রমণ / ৪৩
মেজর জেনারেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, (অব.) বীর বিক্রম

৬. অপারেশন আড়ানি / ৪৮
আজাদ আলী, বীর প্রতীক

৭. অপারেশন জ্যাকপট- দাউদকান্দি / ৫১
শাহজাহান সিদ্দিকী, বীর বিক্রম

৮. পাক-বে ডকইয়ার্ড অপারেশন / ৫৬
মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন, বীর প্রতীক

৯. সাফল্য নিয়ে ক্যাম্পে ফিরি / ৬০
শাহজামান মজুমদার, বীর প্রতীক

১০. সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করি / ৬৯
মো. আবুল খায়ের বিশ্বাস

১১. ভয়শূন্য চিত্তে যুদ্ধ করি / ৭৩
মো. রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

১২. তেঁতুলিয়া সাব সেক্টরের যুদ্ধ / ৭৬
মেজর জেনারেল মাসুদুর রহমান, (অব.) বীর প্রতীক

১৩. মাকে ভালোবেসে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি / ৮৪
ইউ কে চিং, বীর বিক্রম

১৪. মেজর খালেদ মোশাররফ : অনন্য আদেশ, দুঃসাধ্য কাজ / ৯৩
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

আখাউড়া এলাকার কয়েকটি যুদ্ধ

মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

একাত্তর সাল। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার মহাজাগরণের উত্তাল তরঙ্গ সর্বত্র তথা সারা বাংলার আনাচে-কানাচে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতীকে জাগিয়ে তুলেছিল। স্বাধিকার আন্দোলন থেকে এক দফা স্বাধীনতার জাগরণে জেগে উঠেছিল টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত, সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক বাঙালি নারী-পুরুষ । তাই রেসকোর্স ময়দানে ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠে যে সত্য উচ্চারিত হয়েছিল সেই উচ্চারণই ছিল স্বাধীনতার এক দফার ঘোষণা—এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায় দুর্গ গড়ে তোল। জয় বাংলা। বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধের দিক নির্দেশনা। তাই ৭ই মার্চ হতেই বাংলার সর্বস্তরের জনগণ, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে-গঞ্জে টেকনাফ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি (স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছিল।) আমরা বাঙালি সৈনিকরাও ৭ই মার্চের ভাষণেই স্বাধীনতার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা পেয়েছিলাম। আমরা প্রথমে পাকিস্তানের ডেরা ইসমাইল খানে জিসি ট্রেনিং শেষে, ও পরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার (ইবিআরসি) চট্টগ্রামে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে ঢাকা সেনানিবাসের বালুরঘাট বিমান বাহিনীর সাথে ৩৮ নং প্লাটুনে যুদ্ধ বিমান সংরক্ষণ কোম্পানির এমওডিসিতে যোগদান করি। আমরা সকলেই ছিলাম ১৭/১৮ বৎসরের নবীন সৈনিক, উত্তপ্ত, টগবগে রক্ত, রাজনীতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই আমাদের ছিল না। তবে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী কোনো রকমেই হার মানতে চাইবে না, যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধ ছাড়া পাকিস্তানি শাসকদের হার মানানো সম্ভব নয়।

৭ই মার্চের পর প্রতি মুহূর্তই ছিল শ্বাসরুদ্ধকর তারপর অবাঙালি বিহারিদের যেখানেই অবস্থান ছিল, সেখানেই ঘটছিল অপ্রীতিকর ঘটনা। বিহারিদের আচরণে সেদিন মনে হয়েছিল তারাই এদেশের নাগরিক। আমরা বাঙালিরা মোহাজের ও উদ্বাস্তু!

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রতিশোধের আগুনে দপদপ করে জ্বলতে থাকে আর তাই পূর্ব পাকিস্তানের সকল সেনা ছাউনি হতে বাঙালি সৈনিকদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয়, আর বাঙালি সেনাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও নজরদারি করতে থাকে। এমও ডিসিতে আমরা ২৫০ জন বাঙালি সৈনিক বিমান বাহিনীর সাথে একটি ব্যারাকে অবস্থান করছিলাম। ২৩ মার্চ বিকালে ২০জন বাঙালি সৈনিক ঢাকা সেনানিবাস বালুরঘাট ব্যারাক হতে বর্তমান পুরাতন বিমান বন্দরের উত্তর দিকে রানওয়ের মাথায় যুদ্ধ বিমান রক্ষিত বাংকারে নায়েক সুবেদার রশিদ সাহেবের নির্দেশে ডিউটিতে আসি। নায়েক সিদ্দিকের নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিকরা ২০ জনের একটি গ্রুপ ডিউটিতে রত হই। (১) নায়েক সিদ্দিক (২) ল্যান্স নায়েক মতিউর রহমান (৩) ল্যান্স নায়েক আনিসুর রহমান, ময়মনসিংহ (৪) ল্যান্স নায়েক দেলোয়ার হোসেন, ফরিদপুর (৫) সিপাহী দিলদার, রংপুর (৬) সিপাহী শাহজাহান, বরিশাল (৭) সিপাহী আবদুল কুদ্দুস, নড়াইল (৮) সিপাহী গোলাম নবী, নড়াইল (৯) সিপাহী আইন উদ্দিন, বরিশাল (১০) সিপাহী লুৎফর রহমান, পাবনা (১১) সিপাহী শাহজাহান, বরিশাল (১২) সিপাহী শেখ সালাম, বরিশাল (১৩) সিপাহী কেরামত আলী, ময়মনসিংহ (১৪) সিপাহী চৌধুরী, নোয়াখালী (১৫) সিপাহী মোকলেস, ফরিদপুর (১৬) সিপাহী শাহাবুদ্দিন, বরিশাল (১৭) সিপাহী আবদুল মতিন, কুমিল্লা (১৮) সিপাহী আনোয়ার, কুমিল্লা। এখানে ডিউটিরত অবস্থায় ভয়াবহ আক্রমণের আশঙ্কা করতে থাকি, কারণ বিমান বন্দরের চারপাশে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট যুদ্ধ সাজে বাংকারে অবস্থান নিয়েছে এরই মধ্যে। ২৪ মার্চ ফিল্ড আর্টিলারি ট্যাংক বিমান বন্দরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিয়ে রণসাজে সজ্জিত। পরদিন ২৫ মার্চ রাত্র ৯ ঘটিকার সময় ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে গৃহবন্দি করা হয় এবং এই ২৫ তারিখ রাত্রেই পাক হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের ওপর পৃথিবীর জঘন্য, ঘৃণিত, নৃশংস বর্বোরোচিত আক্রমণ ও হত্যা চালায়। আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ঘর-বাড়ি, অগণিত নর-নারী, শিশু-কিশোর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের হত্যা করে হানাদার বাহিনী, অপারেশন সার্চলাইট পরিকল্পনামাফিক তাদের আর্টিলারি ফিল্ডকে আর্টিলারি আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যবস্তু ছিল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, পিলখানা, ইপিআর হেডকোয়ার্টার্স ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন। সার্চলাইট পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২টা ১ মিনিটে পাক হানাদার বাহিনী তেজগাঁও বিমান বন্দর হতে আর্টিলারি/ফিল্ড আর্টিলারি/৪ ইঞ্চি, ৩ ইঞ্চি মর্টার এর গোলার আঘাতে এ এলাকাগুলো তছনছ করে লণ্ডভণ্ড করে ফেলে। তারই সাথে হানাদার বাহিনীর সাঁজোয়া ট্যাংক শহরে প্রবেশ করে বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৫ মার্চ রাত্রে আনুমানিক ১০:৩০ মিনিটের সময় পুরাতন বিমান বন্দরের উত্তর দিকে কাফরুল, পূর্ব আগারগাঁও, পূর্ব শেওড়াপাড়া, কাজীপাড়া জনবসতির ওপর পাকি হানাদার

বাহিনী বর্বরোচিত অত্যাচার চালায়, ঐ সকল গ্রাম থেকে নারীদের ধরে এনে বিমান বন্দরে পৈশাচিকভাবে উলঙ্গ করে ধর্ষণে লিপ্ত হয়। আমরা বিমান বন্দরের উত্তর দিকে তাঁবুতে না থেকে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে এ দৃশ্য দেখে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের অবস্থান টের পেলে আমাদের রক্ষা নেই। তাই আমরা সকলেই পালিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই। রাত্র সাড়ে ১১টায় এখান থেকে রানওয়ের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়াল টপকিয়ে আগারগাঁও, খেজুর বাগান, রাজাবাজার, এলিফ্যান্ট রোড হয়ে রমনা পার্কের মধ্য দিয়ে পুরাতন শহর সিদ্দিক বাজার, কাপ্তান বাজারে গিয়ে নাদির+সামসুর বাহিনীর সাথে যোগ দিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি।

এইভাবে পালিয়ে এসে সরাসরি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলাম। এর কী পরিণাম হবে একবারও সেদিন ভেবে দেখিনি। এর পরিণাম ছিল এই যুদ্ধে হেরে গেলে গাছের সাথে ঝুলিয়ে ফাঁসি। সপরিবারে সকলকে! কিন্তু তারুণ্যে প্রজ্জ্বলিত রক্ত দেশপ্রেম আমাদের সব ভুলিয়ে দিয়েছিল। ভুলে গিয়েছিলাম সেদিন মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-কন্যাকে। সামান্য শক্তি দিয়ে কি আমরা পারবো বিশাল শক্তিশালী পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে? এরকম কোনো কিছুই সেদিন আমাদের মনে জাগ্রত হয়নি। মহান আল্লাহ হয়তো আমাদের মন হতে এই ভয়ভীতিটা তুলে নিয়েছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে জিহাদে অংশ নিতে।

২৫ মার্চ রাত্রে পৌনে ১টা বা ১টার সময়ে বংশাল ফাঁড়ির পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র সব গোলাবারুদ এম্যুনিশন নাদির+সামসুর নেতৃত্বে আমাদের আয়ত্তে নিয়ে নিই এবং পুরান ঢাকার কাপ্তান বাজার, নবাবপুর, সিদ্দিক বাজার এলাকায় পাকিসেনাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে তুলি। যে কারণে ২৫/২৬/২৭ তারিখ পর্যন্ত পাকিসেনারা পুরান ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় সম্মুখ যুদ্ধে জয় বাংলা, জয় বাংলা বলতে বলতে নাদের শহীদ হন। তারপরে আমরা পিছু হটে যাই। ঐ রাত্রেই আমাদের অস্ত্রগুলো ওয়ারীর খ্রিস্টান কবরস্থানের একটি পুরাতন কবরের মধ্যে লুকিয়ে রাখি, কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা রাতেই ঢাকার পূর্বদিকে বিলের মধ্যে অবস্থান নিই। ২৭ তারিখে কারফিউ শিথিল হলে ঢাকার লক্ষ লক্ষ জনতার ঢাকা ছাড়ার মিছিলে আমরাও শরিক হয়ে বিকাল ৫টায় নরসিংদী শহরে পৌঁছাই। সেখানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভলান্টিয়াররা আমাদের সাদরে গ্রহণ করেন ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং নরসিংদী প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য বলেন। আমরা সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআরের ২০ থেকে ২৫ জন সৈনিক নরসিংদীর পশ্চিম দিকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিয়ে যুদ্ধে রত হই। এরই মধ্যে আমাদের কিছু সঙ্গী চলে গেল। আমরা যারা ডিফেন্সে রইলাম তারা পাকিসেনাদের মুখোমুখি যুদ্ধে রত রইলাম। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র আর আমাদের থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও গাঁদা বন্দুক দিয়ে

যুদ্ধ চালিয়ে যাই ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ সকাল পর্যন্ত। ৩০ মার্চ সকাল থেকেই আমাদের উপর ব্যাপক বিমান হামলা হয় আর হানাদারদের সাঁজোয়া ট্যাংকের আক্রমণে নরসিংদী প্রতিরোধ ডিফেন্স তছনছ হয়ে যায়। এই যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হতাহত হন, তাই সেদিন আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলাম চলে গেলাম। আমি লঞ্চযোগে নবীনগর যাই এবং গোপালপুরে মুজিবুর রহমানের বাড়িতে উঠি। এখানে উল্লেখ্য, মুজিবুর রহমানের ছেলে শাহ আলম ঢাকা ছাড়ার মিছিলে নরসিংদীতে একত্রিত হয়। মুজিবুর রহমান সাহেব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন ও প্রাক্তন সৈনিক ছিলেন। মুজিবুর রহমান সাহেব ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের দিক নির্দেশনায় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, মুজাহিদের একটি দল সকলেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৪/২৫ জন সৈনিকের একটি দল প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশি হলেন ও পরের দিন সকালে ১ এপ্রিল নবীনগর লঞ্চঘাট থেকে একটি লঞ্চে করে আমার নেতৃত্বে আমাদের সকলকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাঠিয়ে দিলেন। আমরা বিকাল ৫টায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া গোনঘাট লঞ্চঘাটে পৌঁছলে সেখানে ক্যাপ্টেন গফ্ফার সাহেব আমাদেরকে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরকারি স্কুল মাঠে নিয়ে যান, সেখানে পূর্ব থেকেই ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান নিয়েছে। আমরা ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মিলিত হয়ে বাংলা মাকে উদ্ধারের সংগ্রামে শপথ গ্রহণ করলাম এবং জানতে পারলাম গাজীপুর সেনানিবাস হতে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভৈরব ও আশুগঞ্জে ডিফেন্স নিয়েছে, ওদিকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে কালুরঘাটে ডিফেন্স স্থাপন করেছে ও ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের নেতৃত্বদানকারী মেজর জিয়াউর রহমান কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার, মুজাহিদ সকলকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনবরত আহ্বান করছেন। যা আমি নিজ কানে অনেকবার শুনেছি।

মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে মুক্ত অঞ্চল রাখার জন্য উজানিশ্বর ব্রিজ ভেঙে দিয়ে এর উত্তর প্রান্তে শক্ত ডিফেন্স স্থাপন করেছে। আখাউড়ার দক্ষিণে তিতাস নদীর পাড়ে গঙ্গাসাগর নামক স্থানে ইপিআর সমন্বয়ে ডিফেন্স স্থাপন করেছে। ওদিকে ভৈরব-আশুগঞ্জে ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা ডিফেন্স স্থাপন করেছে যাতে করে ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকি সেনাবাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা সিলেট অভিমুখে আক্রমণ চালাতে না পারে।

প্রথম অপারেশন

আমরা ৭ই এপ্রিল মেঘনা নদী বক্ষে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর একটি শিপ ডুবিয়ে দিতে সক্ষম হই। এরপর ৮, ৯, ১০, ১১ ও ১২ তারিখ পর্যন্ত পাকিহানাদার বাহিনীর জঙ্গি বিমান ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর ব্যাপক আক্রমণের পর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিরস্ত্র বেসামরিক বাঙালিরা নিহত ও আহত হয়, আমাদেরও কিছু মুক্তিসেনা আহত হন। মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে সরিয়ে আখাউড়া জংশনের উত্তর দিকে কল্লা শাহের মাজার সংলগ্ন স্থানে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন। আমাদের রেজিমেন্ট আখাউড়ায় পৌঁছানোর পর সেখানকার আশপাশের জনগণ যা দেখাল তা সহ্য করার মতো নয়। সেখানে আখাউড়া জংশনে কর্মরত অবাঙালি বিহারিরা আজমপুর গ্রামের আশপাশ গ্রামগুলো থেকে অসংখ্য বাঙালিকে ধরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং নারীদের ওপর নৃশংসভাবে অত্যাচার চালায়। আমরা অন্তত ১৮/১৯টি নারীর দেহ দেখেছি যাদের উলঙ্গ অবস্থায় যৌনাঙ্গে বাঁশের লাঠি, গাছের ডাল, লোহার রড ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে অবাঙালি বিহারিরা। এখানে হযরত কল্লা শাহ'র মাজারের খাদেম সাহেব আমাদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করে রেখেছিল। আমরা ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। ক্ষুধা নিবারণ শেষে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে আমাদের শক্তির সঞ্চার হলো—আমরা মুহূর্ত দেরি না করে অবাঙালি বিহারিদের আস্তানা আজমপুর গ্রামে আক্রমণ চালাই—তছনছ করে পুরো বিহারিদের এলাকা খতম করে দিলাম। তারপর আখাউড়া ফিরে এসে সকলে বিশ্রাম নিলাম।

আখাউড়া জংশনের এক মাইল দক্ষিণে গঙ্গাসাগর নামক স্থানে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্লাটুন ইপিআর সৈনিক পাকিসেনাদের সাথে সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধে রত ছিল। মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব হাবিলদার হালিম, হাবিলদার আওয়াল, নায়েক রহমান, লে. নায়েক আর্মি মতিউর রহমানকে এক প্লাটুন সৈনিক (৫০ জন) নিয়ে গঙ্গাসাগর নামক স্থানে দরুইন গ্রামের দক্ষিণে এনডারস্ নদীর উত্তর পাড়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেন। ১৪ এপ্রিল আমরা বিকালের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে সন্ধ্যার আগ মূহূর্তে গঙ্গাসাগর কানের নদীর উত্তর পাশে দক্ষিণমুখো হয়ে অবস্থান নিই। আমার দায়িত্ব পড়ে গঙ্গাসাগর দিঘির ডান দিকে রেললাইনের পূর্বে একটা ডব্লিউ টাইপের বাংকারে মোস্তফা কামালের সাথে (মোস্তফা কামাল ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন দেশপ্রেমিক সাহসী সৈনিক ছিলেন) সম্মুখযুদ্ধে অংশ নেওয়ার। ১৫ এপ্রিল ফজর নামাজের আযানের সাথে সাথে পাকিহানাদার বাহিনী তাদের মুগরা বাজার ক্যাম্প হতে আমাদের উপর আক্রমণ করে, আমরা মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার পাকিবাহিনীর সেই আক্রমণ প্রতিহত করি, সেখানে পাকি হানাদার বাহিনীর অন্তত দুটি কোম্পানি সৈনিক সম্পূর্ণরূপে নিহত ও আহত হয়। অতঃপর সকাল ৯টা হতে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী রেডক্রসের সাদা

পতাকা উড়িয়ে গ্রাম থেকে বাঙালিদের ধরে এনে তাদের নিহত লাশগুলো টেনে টেনে উপরে তুলে নেয় ও বাঙালিদের বন্দি করে রাখে। হানাদার বাহিনীর হিংস্র দানবেরা এনডার্সন নদীর দক্ষিণ পাড়ে বাংকারে অবস্থান নেয়। তাদের এত সৈন্য নিহত হওয়ায় আক্রোশে এ এলাকার মনিয়ন্দ গ্রামসহ আশপাশের গ্রামগুলো আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পুরুষদের ধরে এনে বন্দি করে রাখে, নারীদের বন্দি করে তাদের ওপর চালায় নৃশংস পাশবিক অত্যাচার। তাদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে। এখানে প্রতি মুহূর্তেই সম্মুখ যুদ্ধ চলতে থাকে পাকিস্তানি হানাদাররা আমাদের ওপর আর্টিলারি ফিল্ড আর্টিলারির সেল মেরে পুরা আখাউড়া এলাকা ও আশপাশ প্রকম্পিত করতে থাকে। ১৬ এপ্রিল পূর্বের ন্যায় ফজরের নামাজের সাথে সাথে হানাদার বাহিনীর একটি রেজিমেন্ট আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণও আমরা মুক্তিসেনারা সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করে দিই, যার ফলে হানাদারদের পুরো রেজিমেন্টটাই আহত ও নিহত হয়ে এনডারসন নদীর মধ্যে পড়ে থাকে। এদিনও পাকি হানাদাররা রেডক্রসের পতাকা লাগিয়ে গ্রামের ঐ সকল বন্দি লোক দিয়ে তাদের লাশগুলো টেনে তুলে নেয়। তারপর হায়েনার দল ক্ষিপ্ত হয়ে আমাদের পজিশনের ওপর তাদের ফিল্ড আর্টিলারি/আর্টিলারি/৪" মর্টার/৩" মর্টার/ আর-আর/৮৩ ব্লান্ডার সাইড থেকে ৪/৫শত গোলা প্রতি মিনিটে আমাদের ওপর আঘাত হানতে থাকে এবং মুগরা বাজারের ডিফেন্সের নদীর পাড়ের বাংকারগুলোর ওপর বাঙালি মা-বোনদের বস্ত্রহীন করে মানব ঢাল তৈরি করে মাইকের সাহায্যে চিৎকার করে বলতে থাকে মার তেরা মাকো মার, তেরা বহিনকো মার। আমরা হানাদার বাহিনীর এত কাছাকাছি ছিলাম, যার কারণে আর্টিলারির গোলাগুলো আমাদের পিছনে ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ডিফেন্সের ওপর আঘাত হানতে থাকে। ভীষণ গোলার আঘাতের কারণে আমাদের ওয়্যারলেস যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাসেঞ্জার পাঠানোরও অবস্থা ছিল না। আমাদের ব্যাটালিয়নের সাথে কোনো রকম যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। পরে জানতে পেরেছিলাম আর্টিলারি ফিল্ড আর্টিলারির গোলার আঘাতে আমাদের পিছনের ডিফেন্স লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে, অনেকেই হতাহত হন। যার কারণে ১৬ তারিখেই আমাদের পিছনের ডিফেন্স ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সকল সৈনিকই আখাউড়া ডিফেন্স ছেড়ে আগরতলা চেকপোস্টে গিয়ে ডিফেন্স নেয়। ১৬ তারিখ হতেই আমাদের জন্য কোনোরকম খাওয়া-দাওয়া ও অ্যামুনিশন সাপ্লায়ের ব্যবস্থা ছিল না। আমরা ওখানকার দুরইন গ্রামের এক হিন্দু পরিবারের ছেড়ে যাওয়া বাড়ি থেকে তাদের পূজার জন্য সংরক্ষিত চিড়া, গুড়, মুড়ি দিয়েই আমাদের ক্ষুধা নিবারণ করি। ১৭ এপ্রিল পাকিহানাদাররা আমাদের ওপর পুনরায় আক্রমণ শুরু করে, সেই আক্রমণও আমরা সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ করি। সেদিন সকাল হতেই গুঁড়ি গুঁড়ি ও ভারী বৃষ্টি হচ্ছিল। হাবিলদার আবদুল হালিম, হাবিলদার রহমান, নায়েক বাহাদুর, হাবিলদার আওয়াল ও বিডিআর এর

নায়েক সেকান্দার ও আমি একত্রিত হয়ে ডিফেন্স ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিই। কারণ আমাদের খাদ্য ও অ্যামুনিশন সাপ্লাই নেই। সেখানে বাঁধ সাধে সিপাহী (বীর শ্রেষ্ঠ) মোস্তফা কামাল। সে কোনো রকমেই ডিফেন্স ছাড়তে রাজি হলো না। তার যুক্তি সকলে একসাথে ডিফেন্স ছেড়ে গেলে সকলেই নিহত হব। মোস্তফা কামাল বললেন, আমার কাছে প্রচুর অ্যামুনিশন আছে ও শক্তিশালী ফায়ার সাপোর্ট এইচ.এম.জি (৭.৯২ হেভি মেশিনগান) আছে। তোমরা আমার মেশিনগানের অ্যামুনিশনের চেইনগুলো ভর্তি করে দিয়ে যাও। আমি যাতে শত্রুদের সন্ধ্যা পর্যন্ত আটকে রাখতে পারি এরই মধ্যে তোমরা পূর্বদিকে সরে আগরতলা বর্ডারের দিকে চলে যেতে পারবে। আমরা মোস্তফা কামালকে পীড়াপীড়ি করলাম। তুমি শত্রুর হাতে ধরা পড়লে, তোমার ওপর অনেক অত্যাচার হবে, যা তুমি সহ্য করতে পারবে না। মোস্তফা কামাল এ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আমি আত্মসমর্পণ করবো না শত্রুর হাতে। প্রয়োজন হলে শেষ বুলেট দিয়ে সুইসাইড করবো। যুদ্ধ করতে করতেই শাহাদাত বরণ করবো। তোমরা যদি জীবিত থাক আর দেশ যদি স্বাধীন হয় তোমরা বাঙালি জাতির কাছে গর্বভরে বলোও আমাদের সাথি মোস্তফা কামাল জাতির সাথে বেঈমানি করে নাই।' আমাদের সাথি মোস্তফা কামাল যুদ্ধ করতে করতেই শাহাদাত বরণ করলো। আমরা মোস্তফা কামালের চেইনগুলো ফ্লিম করে বাক্সে সাজিয়ে তাকে রেখেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিছু হটে পূর্ব-উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। কিছুদূর অগ্রসর হতেই পাকিহানাদার বাহিনীর সামনাসামনি হয়ে পড়ি, শুরু হয় সম্মুখ যুদ্ধ, আমরা পজিশন নিই। শত্রুরা গুলি করে, শত্রুরা পজিশন নেয়, আমরা উঠে দৌড় দেই, শত্রুরা আমাদের উপর গুলি করতে থাকে, আমরা পজিশন নিই ও গুলি করতে থাকি। এমন করতে করতেই পূর্ব-উত্তর দিকের হাওর পাড়ে এসে পৌঁছাই। আল্লাহর অশেষ রহমতের কারণেই আমরা এখানে নিরাপদে এসে যাই। শত্রুরা পজিশন নিয়েছে ঠিক সেই সময়-শত্রুদের আর্টিলারির গোলাগুলি শত্রুদের উপরই আঘাত হানতে থাকে। এই সুযোগে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা হাওরের মধ্য দিয়ে বোরো ক্ষেত মাড়িয়ে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে থাকি কোথাও মাজা পানি কোথাও হাঁটু পানি- কাদা, কচুরিপানা ঠেলে পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে এক সময় হাওর পাড়ি দিয়ে আগরতলার বর্ডার সংলগ্ন গ্রামে পৌঁছে যাই। এখানে আমরা আমাদের ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে মিলিত হই, আমরা যারা গঙ্গাসাগরে ডিফেন্সে ছিলাম তারা সকলেই নিদ্রাহীন ও অনাহারী তাই সকলে ক্লান্ত, অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। সেখান থেকে আমাদের সঙ্গীরা আমাদেরকে আগরতলার ভেতরে নিয়ে আসে এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। আমাদেরকে আগরতলার ভেতরে নিয়ে আইনুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে সি কোম্পানির কমান্ড প্রদান করেন। আইনুদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে আমরা সি কোম্পানির সদস্যরা মনতলিতে ক্যাম্প স্থাপন করি। কয়েক দিন বিশ্রামে থাকার পর সুস্থতা ফিরে পাই।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমরা মনতলি ক্যাম্প হতে পশ্চিম দিকের মনিয়ন্দ গ্রামে রেললাইনে পাকিস্তানি হানাদারদের একটি প্লাটুনকে অ্যামবুশে আটকাই। সেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এক প্লাটুনের প্রায় সকল সৈন্যই নিহত-আহত হয়। মনিয়ন্দ থেকে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প মুগরা বাজার আধা মাইলের মতো, তাই আমরা সেখান থেকে দ্রুত পূর্বদিকে আমাদের মুক্তাঞ্চলে চলে আসি। জুলাই মাসের ১০/১১ তারিখ পাকিস্তানিদের আর্টিলারি ডিফেন্স তিলকপুর নামক স্থানে সন্ধ্যার সাথে সাথে চুপিসারে শত্রুর কাছাকাছি গিয়ে আমরা মুক্তিসেনারা অতর্কিতে আক্রমণ করি এবং পাকিস্তানিদের পালাতে বাধ্য করি। আমরা সেখানে ৫টি ফিল্ড আর্টিলারি ব্যারেলের ভেতর গ্রেনেড ফাটিয়ে নষ্ট করে দেই, কারণ গানগুলো টেনে আনার কোনো ব্যবস্থা আমাদের ছিল না।

কসবা স্টেশনের উত্তর দিকে ইমামবাড়ি স্টেশনে জুলাই মাসের শেষ দিকে দুপুর ১২টার দিকে আমরা এমবুশ করি। সেই এমবুশে পাকিস্তানি হায়েনাদের একটা কোম্পানি আটকাই। স্থানটা ছিল ইমামবাড়ি স্টেশনের দক্ষিণ কসবা স্টেশনের উত্তরে পূর্বে গোপিনাথপুর, পশ্চিমে ল্যান্তাবাজ পূর্বে গ্রাম। আমরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে একটি গ্রুপ স্টেশনে অবস্থান নেই, অন্য একটি গ্রুপ আমি নিজে ল্যান্তাবাজ গ্রামের পূর্ব দিকে রেললাইনের দিকে মুখ করে অবস্থান নিই। স্টেশনের পূর্ব দিকে এখানে দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত একটানা যুদ্ধ চলতে থাকে। সেই যুদ্ধেও পাকিস্তানি হায়েনারা পরাজিত হয়ে নিহত ও আহত হয়ে পড়ে থাকে। পরবর্তী সময় কুটির ছতরা, চানপুর/মুগরা বাজার ক্যাম্প হতে হায়েনারা এসে তাদের আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

জুলাই মাসের ১০/১১ তারিখ সায়েদাবাদ গ্রামের পূর্বদিকে এবং ল্যান্তাবাজ গ্রামের পশ্চিম দিকে সিএন্ডবি রোডে একটি কালভার্ট ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় আমাদের ওপর। মতিউর রহমান, মো. হোসেন, আবদুল লতিফ, আ. খালেক, আ. মজিদ বীর প্রতীক, দেলোয়ার হোসেন বীর প্রতীক ও আ. ছাত্তার, ৬ জনের এই অপারেশন গ্রুপটি আনুমানিক রাত ১১টার দিকে সিএন্ডবি রোডের কালভার্টের নিচে পৌঁছাই এবং এক্সপ্লোসিভ ও কাটিং চার্জ লাগিয়ে ইকোপ্লাস্টার লাগাতে থাকি। এমন সময় সেখানে হঠাৎ করে একটি পাকিস্তানি ডজ গাড়ি এসে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। আমাদের সাথে একজন বন্ধু ভয় পেয়ে তার হাতের গ্রেনেড পাকিস্তানিদের ওপর ছুঁড়ে মারে যে কারণে আমাদের পজিশনটি প্রকাশ হয়ে যায়, পাকিস্তানিরা আমাদের দুই বন্ধু আ. খালেক ও আ. ছাত্তারকে তাৎক্ষণিক গুলি করে হত্যা করে। আমাদেরকে হ্যান্ডসআপ করে উপরে উঠার জন্য নির্দেশ করে। এই সময় ঐ পাকিস্তানিদের মধ্যে হতে একজন কমান্ডার চিৎকার করে বলতে থাকে ইনকো মাত মারো ইনকো পাকড়ালো, যিয়াদা ইনাম মিলেগা। একথা শুনে আমার মনে হল এখনি আমাদেরকে মারবে না হয় ধরে

নিয়ে যাবে তারা, বেশি পুরস্কার পাওয়ার আশায়। তাৎক্ষণিকভাবে আমি আমার কমান্ডো প্রশিক্ষণের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে থাকি। আমি বাংলাতে আমার সহযোদ্ধাদের বললাম, ধরা পড়ার চেয়ে গুলি খেয়ে মরে যাওয়া ভালো। অতএব আমার মনে হয় এখান থেকে আমরা বেঁচে যেতে পারব, রিস্ক নিতে হবে। আমি প্রতি মুহূর্তেই ঘটনার পর্যালোচনা করছিলাম, প্রথম দিকে আমার বন্ধু মো. হোসেনকে উপরে উঠিয়ে সৈনিকদের মধ্য হতে একজন অফিসার তার ডান হাতের অস্ত্রটা বাম হাতে নিয়ে রাস্তার উপরে উঠার সাথে সাথে বন্ধুকে সজোরে বাইনচোত বলে গালি দিয়ে থাপ্পড় মারে, সে রাস্তার উপর পড়ে যায়। ২ জন পাকিস্তানি সৈনিক এসে তার বুকের উপর বুট দিয়ে চাপ দিয়ে রাইফেলের নলটা বুকের উপর ঠেকিয়ে রাখে, এ সময় ওই পাকিস্তানি অফিসারটি চিৎকার করে বলতে থাকে ইনকো মাত মারো, পাকড়ালো, আমার ২য় সহযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন বীর প্রতীক তাদের কমান্ড মতো উপরে ওঠে, অনুরূপ তার উপরেও বাইনচোত শব্দটি বলে ডান হাতের অস্ত্রটা বাম হাতে নিয়ে সজোরে থাপ্পড় মারে। ৩য় সহযোদ্ধা আ. রশিদ বীর প্রতীক এর বেলায়ও অনুরূপ হলো। এবার আমার পালা। ৪র্থ জন আমি ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা করে ফেলেছি, আমি উপরে উঠার সাথে সাথে আমাকে থাপ্পড় মারলে আমি পড়ে যাওয়ার ভান করে অফিসারের বাম হাতের অস্ত্রটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। পরিকল্পনা মাফিক আমি উপরে উঠলে সাথে সাথে আমাকে বাইনচোত গালি দিয়ে থাপ্পড় মারলে আমি পড়ে যাবার ভান করে অফিসারের বাম হাতের অস্ত্রটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহর অশেষ রহমতে অস্ত্রটি আমার হাতে চলে আসে। আমি ইয়া আলী চিৎকার দিয়ে সেখান থেকে লাফ দিয়ে একটু দূরে সরে যাই এবং আমার হাতের অস্ত্রটি দিয়ে দাঁড়ানো পাকিস্তানি সৈনিকদের ওপর ব্রাশ ফায়ার করতে থাকি। পাকিস্তানি সৈনিকরা গুলিতে আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, আমি একটু দূরে সরে গিয়ে পজিশন নিয়ে গুলি করতে থাকি। আরো একটু দূরে যেয়ে রাস্তার নিচে নেমে পড়ি আর ধানক্ষেত দিয়ে পশ্চিম দিকে সাঁতরাতে সাঁতরাতে পাশের গ্রাম সায়েদাবাদে গিয়ে উঠি। সেখান থেকে চুপিসারে আরও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকি। এরই মধ্যে কখন যে রাত শেষ হয়েছে বুঝতে পারিনি। ইতোমধ্যেই মসজিদে মসজিদে ফজরের আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক দরিদ্র গৃহস্থের ভাঙাচোরা বাড়িতে উঠে তাদের বিস্তারিত বলি। বাড়ির মালিকের নাম ছিল বেলায়েত, সে আমাকে তার ভাঙা ঘরের ভেতর লুকিয়ে রাখে এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করে, সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে আমাকে নিয়ে বেলায়েত ভাই ঐখান হতে প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে দিয়ে আগরতলায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি স্থানে প্রথমে বিএসএফ এর সাহায্যে ও পরে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যে আমি আবার মনতলি ক্যাম্পে ফিরে যাই। আমার সাথি সহযোদ্ধারাও ৩/৪ দিন পর মনতলি ক্যাম্পে ফিরে আসে।

ঘটনাস্থলে ২জন শাহাদাত বরণ করেন। দুই বন্ধু আ. ছাত্তার ও আ. খালেক ঐ ব্রিজের নিচে চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকে। জানি না তাদের লাশ দুটির কী হয়েছিল।

জুলাই মাসের শেষে আইনুদ্দিন সাহেব আমাদের ৪০ জনের একটি টিম করে সিঅ্যান্ডবির রাস্তার পশ্চিমদিকে পাঠান। রাজাকার মুক্ত অঞ্চল গঠন করতে হবে। এই এলাকা দিয়ে যাতে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় বা ঢাকার আশপাশে যেতে পারে। কাজটি করা ছিল খুবই কঠিন, তারপরও কমান্ডারের নির্দেশ মানতে হবে। তাই আমরা মনের মধ্যে কোনো রকম ভীতি না নিয়ে নির্দেশ মেনেছিলাম। আর আমরা তো পূর্বেই আমাদের জীবনটা আল্লাহ রাস্তায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদে দেশ মাতাকে মুক্ত করার জন্য সঁপে দিয়েছি ভয় কিসের! ৪০ জনের গ্রুপটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে । এক গ্রুপের দায়িত্ব নেন হাবিলদার আউয়াল যিনি ওই অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দা। অপর দলটির দায়িত্ব হাবিলদার আবদুল হালিম, যার দ্বিতীয় কমান্ডার হিসাবে ছিলাম আমি। আমরা ওই অঞ্চলে রাত্রে প্রবেশ করি এবং আওয়ামী লীগ নেতা বাড্ডার মনা আক্তারের বাড়িতে অবস্থান নিই। সেখানে দুই দিন দুই রাত আত্মগোপন করে থেকে পরিকল্পনা করি কীভাবে ওই এলাকা মুক্ত করা যায়। এলাকাটি ছিল শান্তি বাহিনীর বাপস কমিটি ও রাজাকারদের এলাকা। পরিকল্পনা হলো এখানে ত্রাস সৃষ্টি করে পাকিস্তানি দোসরদের মনে ভীতি সৃষ্টি করা। সময়টা ছিল বর্ষাকাল। চতুর্দিকে পানিতে ডোবা। নৌকা ছাড়া চলাচলের উপায় ছিল না। পরিকল্পনামাফিক আমরা দুটি নৌকাযোগে রাত্রে এলাকার (চারগাছ এলাকা) পিস কমিটির চেয়ারম্যান তিনজন, শান্তি বাহিনীর মেম্বার ৬ জনকে ধরে নিয়ে আসি এবং মরা তিতাস নদীর মাঝে হাত-পা বেঁধে ফেলে দিই, গুলি খরচ না করে। পরবর্তী সময়ে তারা মৃত্যুবরণ করে নদীতে ভাসতে থাকে। এই অপারেশনের উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করা, দেশপ্রেমিক মুক্তিসেনারা এলাকায় প্রবেশ করেছি তারই জানান দেওয়া। এই অপারেশনে কাজও হয়েছিল তাই রাজাকাররা পালিয়ে যায়। এলাকাটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আমরা মুক্তভাবে চলাফেরা করতে থাকি। জুলাই মাসের শেষের দিকে সায়েদাবাদ গ্রামের পূর্ব দিকে সিএন্ডবি রোডে রাত্রে-একটি অপারেশন করি এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর তিনটি সাঁজোয়া ট্রাককে বা (৮৩ ব্লান্ডার সাইড) এর সেলের আঘাতে ধ্বংস করি এবং ঐ ট্রাকের সকল সৈনিক আহত ও নিহত হয়। সেখান থেকে আমরা আমাদের বিশ্রাম নেওয়ার স্থান মেহারি গ্রামে এসে রাত্রে অবস্থান নিই। ঐদিনই সকালবেলা ফজরের আজানের সাথে সাথে পাকিহানাদার বাহিনী আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আমরা সেই আক্রমণ প্রতিহত করি ও হানাদারদের একটি কোম্পানির সকল সদস্য নিহত ও আহত হয়। আগস্ট মাসের প্রথমদিকে ৪ বা ৫ তারিখ মিরপুর নামক গ্রামে পাকিস্তানি হায়েনারা ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও এলাকার লোকদের উপর অত্যাচারে লিপ্ত থাকে। আমরা সংবাদ পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছাই এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি ও

সম্মুখ যুদ্ধ শুরু করি। এখানেও পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ব্যাপকভাবে হতাহত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের সংগ্রামী মুক্তিসেনা মো. শহীদ শাহাদাত বরণ করেন, যাকে আমরা সমাহিত করেছি বিটঘর হাই স্কুল মাঠের এক প্রান্তে। এই এলাকায় মুক্তাঞ্চল গঠন করায় ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সেনানায়করা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে এবং বড় ধরনের আক্রমণের পরিকল্পনা করে। একসাথে ৩/৪টি ব্যাটালিয়ন/রেজিমেন্ট একত্রে আক্রমণ করে এলাকাটি তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য। এরই প্রেক্ষিতে আনুমানিক ১৯ আগস্ট চারগাছ বাজার ও পাশের গ্রামগুলোর উপর সারাদিন সারারাত ব্যাপক আর্টিলারি ও ফিল্ড আর্টিলারি গোলা আঘাত হানতে থাকে। যার ফলে অত্র এলাকার বাড়ি-ঘর তছনছ হয়ে টিনের চালাগুলো ঝাঁজরা হয়ে যায় এবং গাছপালা ভেঙে পড়ে। আমরা পূর্ব থেকেই জানতে পারি অবিলম্বে হানাদার আমাদের এলাকায় আক্রমণ চালাবে। আমরাও এলাকার অন্যান্য সকল মুক্তিযোদ্ধাদের এ বিষয়ে অবগত করি এবং তাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বলি। ২১ আগস্ট পকিস্তানি হানাদার বাহিনী এলাকায় তিন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। এদের একটি দল আসে তিতাস নদীর উত্তর পূর্ব দিক দিয়ে ৫টি লঞ্চ, ৫টি গানবোট ও ১০টি নৌকাযোগে এবং পূর্ব দিক তিললাকপুর থেকে আর একটি গ্রুপ অগ্রসর হতে থাকে স্থলপথে ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক মান্দারপুর, যবিন, মেহারীর দিক থেকে অপর একটি রেজিমেন্ট অগ্রসর হতে থাকে। আমরা এই যুদ্ধ প্রতিহত করার জন্য চারগাছ বাজারে ডিফেন্স নিই। কারণ শত্রুদের লক্ষ্য চারগাছ বাজার তাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া। এখানে উল্লেখ্য যে হাবিলদার আউয়ালের গ্রুপকে আমরা যুদ্ধে অংশ নিতে বলি। ২, হাবিলদার রেজাউলের গ্রুপকে যুদ্ধে অংশ নিতে বলি ৩, হাবিলদার গিয়াস উদ্দিনের গ্রুপকে যুদ্ধে অংশ নিতে বলি ৪, নবীনগরের মিজানের গ্রুপকে যুদ্ধে অংশ নিতে বলি। দুঃখের বিষয় হাবিলদার হালিমের গ্রুপ ছাড়া এই যুদ্ধে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করেনি। এই যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর ৫টি লঞ্চ, ৫টি গানবোট, ১০টি নৌকায় আসা এক হাজার সদস্যের হানাদারী আক্রমণকে সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করি। আমরা মুক্তিসেনারা হানাদার বাহিনী যখন চারগাছ এর পূর্বে ব্রিজের নিকটে এসে নামে ও ব্রিজ পার হয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকে চারগাছ বাজারের দিকে এবং হায়েনারা যখন পুরোপুরি আমাদের অ্যামবুশের মধ্যে এসে যায় তখনি তিনদিক থেকে ত্রিমুখী আক্রমণ চালাই। এতে হায়েনাদের ৫টি লঞ্চই পানিতে ডুবে যায় এবং হানাদার বাহিনীর একটি রেজিমেন্টের সকল সৈনিকই নিহত ও আহত হয়ে পড়ে থাকে। এই যুদ্ধ দুপুর ১টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলে। আমাদের অ্যামুনিশন স্বল্পতার কারণে আমরা পিছু হটে কালিগঞ্জ বাজারে অবস্থান নিই। এই কালীগঞ্জ বাজার এলাকা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্ত এলাকা। এখানে কয়েকদিন অবস্থান নেওয়ার পর আইনুদ্দিন সাহেব আমাদেরকে আগরতলা ক্যাম্পে চলে আসার জন্য নির্দেশ পাঠান। আমরা ২/৩ অক্টোবর মনতলি ক্যাম্পে পৌঁছালে সেখানে কয়েকদিন বিশ্রামের পর আমাদের কসবা

রেল স্টেশন সংলগ্ন কমলাসাগর নামক স্থানে লে. ইকবাল সাহেবের সাথে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেন। আমরা সেখানে পৌঁছে পাহাড়ের ঢাল কেটে ক্যাম্প স্থাপন করি, এখানে সাপ, বিচ্ছু, চেলা ও চিনে জোঁক এর সাথে দুর্বিষহ অবস্থায় অবস্থান করতে থাকি। ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানির সকল সদস্যই মুক্ত অঞ্চল গঠন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি। আমরা বার বার আমাদের ৯ম বেঙ্গলের সিও সাহেবের সাথে মুক্ত অঞ্চল গঠন করার ও আক্রমণ করার অনুমতি চাইতে থাকি। কিন্তু উপর কমান্ড থেকে আক্রমণ করার জন্য আদেশ বা নির্দেশ না থাকায় আমরা নির্দেশ পেলাম না। সাথি মুক্তি পাগল যোদ্ধাগণ দুর্বিষহ অবস্থা হতে অবসানকল্পে হাবিলদার হালিম, হাবিলদার রেজাউল, হাবিলদার গিয়াস উদ্দিন, নায়েব বাহাদুর ও আমিসহ অন্যান্য বন্ধুদেরকে নিয়ে পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো- এ রকম দুর্বিষহ জীবনযাপনের চেয়ে মুক্ত অঞ্চল গঠন করতে গিয়ে যদি মৃত্যু হয় তাও শ্রেয়। অক্টোবর মাসে পরিকল্পনামাফিক সি কোম্পানির সদস্যদের নিয়ে মুক্ত অঞ্চল গঠন করার সিদ্ধান্ত হলো। উপরের হুকুম ছাড়াই পরিকল্পনায় উপনীত হলাম। পরিকল্পনাটি তিনভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম দল হাবিলদার হালিম ও মতিউরের নেতৃত্বে ফায়ারিং মুভ করে দৌড়ে রেললাইন পার হয়ে শত্রুদের পেছনে গিয়ে অবস্থান নেওয়া হবে এবং শত্রুদের ওপর আক্রমণ করতে থাকবে। শত্রুরা তাদের রাইফেল ও সকল অস্ত্রশস্ত্রের নল পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে গুলি করতে থাকবে। ঠিক সেই সময় ২য় দলটি হাবিলদার রেজাউল করিম ও নায়েক বাহাদুরের নেতৃত্বে আক্রমণ করবে এবং পিছন থেকে শত্রুদের বাংকারগুলোতে গ্রেনেড আক্রমণ করে তছনছ করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের লঙ্গরখানার পাশে অবস্থান নেবে। ৩য় দলটি অগ্রসর হয়ে কসবা থানার দিকে এগিয়ে যাবে এবং কসবা থানার আশেপাশে পজিশন নেবে এবং এ অবস্থায় সুবেদার ওহাব সাহেব তার মর্টার প্লাটুন নিয়ে প্রস্তুত থাকবে। আমাদের আক্রমণে শত্রুরা যখন ছোটাছুটি করবে ঠিক তখনই সুবেদার ওহাব সাহেব তার ৩ ও ৪ ইঞ্চি মর্টার দিয়ে অনবরত গোলাবর্ষণ করতে থাকবে। পরিকল্পনামাফিক উপরের নির্দেশ ছাড়াই ২২ অক্টোবর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার অপেক্ষায় ঠিক তখনই আমরা পরিকল্পনা-মাফিক আক্রমণ শুরু করলাম। যথাযথ প্রথম দলটি কসবা রেল স্টেশন ও রেললাইনের ওপর দিয়ে দৌড়ে শত্রুদের পিছনে গিয়ে পজিশন নিলাম এবং শত্রুদের ওপর আক্রমণ হানতে লাগলাম। শত্রুরাও তাদের রাইফেল ও অস্ত্রের নল পশ্চিম দিকে ঘুরিয়ে আমাদের দিকে আক্রমণ করে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে ২য় দলটি পরিকল্পনামাফিক আক্রমণ হানল শত্রুদের পিছন থেকে পূর্ব দিক দিয়ে শত্রুদের বাংকারগুলো রেললাইনের পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করা অবস্থায় ছিল। শত্রুরা যখন তাদের রাইফেলের নল পশ্চিম দিকে ঘুরালো তখনই পেছন হতে আমাদের মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড আক্রমণে শত্রুর বাংকারগুলো তছনছ করে শত্রুদের নিহত করে ফেলল। এমন সময় ৩য় দলটিও আমাদের প্রথম

দলটিকে অতিক্রম করে পশ্চিম দিক দিয়ে অগ্রসর হয়ে লঙ্গরখানার ও কসবা থানার পাশে গিয়ে পজিশন নিয়ে আক্রমণ শুরু করল। পাকহানাদাররা রাতে খাওয়া-দাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল। শত্রুরা অস্ত্র নিয়ে পজিশনে যাওয়ার পূর্বেই এলাকাটি দখলে নিয়ে নিলাম। শত্রুরা দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পালাতে লাগল। সুবেদার ওহাব সাহেব এমন একটি অবস্থার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, এবার তার ৩ ও ৪ ইঞ্চি মর্টার শেল অনবরত আক্রমণ করতে লাগলো। কসবা থানা, কসবা নতুন বাজার ও কসবা স্টেশন পুরোটাই আমাদের দখলে এল। এই গোপনীয় আক্রমণটি আমাদের মিত্র বাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনী ও আমাদের সেক্টর কমান্ডার ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও কেউই জানতেন না। আমাদের এই আক্রমণের ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বর্ডার সংলগ্ন তাদের আর্টিলারি ও ফিল্ড আর্টিলারি কামানের গোলার আঘাতে আগরতলা শহর প্রকম্পিত করে তুলল। ২ নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব আমাদের দখলকৃত অঞ্চলে ছুটে এলেন এমন সময় এয়ার ব্রাসের গোলার শেলের স্প্রিন্টার লেগে মেজর খালেদ মোশাররফ সাহেব গুরুতর আহত হলেন। আমরা ধরাধরি করে তাঁকে আগরতলা পাঠিয়ে দিলাম। এরই মধ্যে পুরো অঞ্চলটি আমরা পুরোপুরি দখলে নিয়ে পজিশন শক্ত করে শত্রুদের পাল্টা আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রইলাম। আমাদের এই অনির্ধারিত আক্রমণের জন্য ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার, ২ নং সেক্টরের কমান্ডার, ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও আমাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন ও সাহসিকতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। অক্টোবর মাস চলে গেল। যুদ্ধের আট মাস অতিবাহিত হলো। আমাদের প্রবাসী সরকারকে ভারত সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও পদাতিক বাহিনীকে প্রবাসী সরকারের আন্ডার কমান্ডে নিয়ে কে ফোর্স, এস ফোর্স, জেড ফোর্স সৃষ্টি করে সরকারের নিয়মিত সেনাবাহিনী সৃষ্টি করলেন। ২১ নভেম্বর কসবা থানার উত্তর দিকে চন্দ্রপুর গ্রামের উত্তর পাশে লতিয়ামোড়ায় শত্রুসেনাদের এ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটি সেখান হতে আগরতলা আক্রমণ করার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করল। পূর্ব থেকেই এ খবরটি আমাদের রেকির আওতায় ছিল, তাই আমাদের উপরে নির্দেশ হলো লতিয়ামোড়ার হানাদারদের ডিফেন্স আক্রমণ করতে হবে ও শত্রুদের ডিফেন্স আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিতে হবে। সেই মোতাবেক নবম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সি কোম্পানির কোম্পানি কমান্ডার লে. আজিজ, হাবিলদার হালিম, হাবিলদার আওয়াল, হাবিলদার গিয়াস, নায়েক বাহাদুর, ইপিআরের নায়েক জলিল, নায়েক আবদুল লতিফ, নায়েক খালেক, নায়েক মতিউর রহমান ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ২১ নভেম্বর ১২টা ১মিনিটে লতিয়ামোড়া আক্রমণের উদ্দেশে রওয়ানা হই। আমাদের দায়িত্ব ছিল চন্দ্রপুর গ্রামের পশ্চিম দিয়ে রেললাইনের পূর্ব দিয়ে লতিয়ামোড়ার পশ্চিমের গ্রামটিতে শত্রুদের পজিশনের উপর আক্রমণ করা। শুরুতেই পৌনে ১টার দিকে আমাদের কমান্ডার লে.

আজিজ শত্রুর গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। ওদিকে লতিয়ামোড়ার পূর্ব দিক থেকে মিত্র সেনাদের একটি রেজিমেন্ট লতিয়ামোড়া আক্রমণ করে, উল্লেখ্য আমাদের মিত্র বাহিনীর প্রায় ১ কোম্পানি সৈনিক এখানে শাহাদাত বরণ করেন। আমাদের ৯ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট সি কোম্পানির লে. আজিজ, হাবিলদার হালিম, নায়েক বাহাদুর, মো. হোসেনসহ ৬০জন মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন এবং প্রায় ১০০জন মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধা গুরুতর আহত হয়। এখানে উল্লেখ্য, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর ৩/৪টি ব্যাটালিয়ন লতিয়ামোড়ায় পূর্বে অবস্থান করছিল। আমাদের আক্রমণে শত্রুদের সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছিল। আমি ভোর ৪টার সময় শত্রুদের এক ব্রাশফায়ারে আহত হই। আমার ডান হাতটার উপরের ভাগের হাড়গুলো ভেঙে গুড়ো গুড়ো হয়ে যায় ফলে আমার ডানহাতটি পিছনে হেপারসিকের সাথে বেঁধে রাখা হয়, এ অবস্থায় আমি অনুভব করি ডান হাতটি হয়তো কেটে পড়ে গেছে তাই আমাদের দখলকৃত শত্রুসেনাদের একটি বাংকারে ঢুকে ব্যথা নিবারণ ইনজেকশন লাগিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতে থাকি। সকাল ৮টা পর্যন্ত আমার জ্ঞান ছিল, রক্ত ঝরতে ঝরতে শরীরের রক্ত কখন যে শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পারিনি, জানতে পারিনি। জ্ঞান ফিরলে বুঝতে পারি একটি সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। একটু সুস্থ হয়ে বুঝতে পারি আমার ডান হাতটি তখনো আছে। আমার চিকিৎসা প্রথমে আগরতলা সালবোন, দ্বিতীয়ত গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে, তৃতীয়ত পাটনা সামরিক হাসপাতালে ৪র্থ লক্ষ্ণৌ সামরিক হাসপাতালে, ৫ম পুনা আর্টিফিসিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে ১৯৭২ সালের ২২ এপ্রিল কলকাতা হয়ে যশোর সেনানিবাসে ফিরে আসি, সেখান হতে আমাকে ৯ বেঙ্গল রেজিমেন্ট পাঠায়। ঢাকা শেরেবাংলা নগর ক্যাম্পে আমাদের বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যুক্ত হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকি। এখান থেকে ১৯৭২ সালের শেষের দিকে আমার পূর্বের অবস্থানে (বিমান বাহিনী, ঢাকা) প্রেরণ করেন। এখানে বৈষম্যের কারণে আর চাকরি করা হয়নি। এরপর বেসামরিক জীবনে ফিরে যাই।

মতিউর রহমান, বীর প্রতীক

জন্ম : ২১ এপ্রিল ১৯৪৯, নড়াইল। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন প্রারম্ভিক সময়ে একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে। দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে আহত হন।

তার বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।

কুমিল্লা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা

গোলাম মুস্তাফা

২৫ মার্চ, ১৯৭১। মাকে নিয়ে বেড়াতে আসলাম কুমিল্লা শহরে বড় বোনের বাসায়। আমার বড় ভগ্নিপতি কলিম উল্লাহ ভূঞা তখন কুমিল্লার ডেপুটি রেভিনিউ কালেক্টর। তাদের বাসা ছোটরায়, কুমিল্লা পুলিশ লাইনের কাছে, জেলখানা সংলগ্ন। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা চলমান আন্দোলন ও সংগ্রাম নিয়ে গল্প-গুজব করছি। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে শুরু হলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গোলাগুলি। ২/৩ মিনিট পরে গগন-বিদারী শব্দে ধ্বনিত হতে থাকলো "জয় বাংলা" এবং বিরামহীনভাবে শুরু হলো রাইফেলের গুলি। সবাই ফ্লোরে শুয়ে পড়লাম। বুঝলাম, পাকিস্তানি সৈন্যরা কুমিল্লা পুলিশ লাইনের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করছে এবং বাঙালি পুলিশ বাহিনী তা প্রতিহত করছে। তুমুল যুদ্ধ। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের বিপুল সংখ্যা ও অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিরুদ্ধে স্বল্প সংখ্যক পুলিশ মান্ধাতা আমলের থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল দিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। পুলিশ বাহিনীর অনেকেই হতাহত হলেন। রাত প্রায় ২ টার দিকে তারা পশ্চাদপসরণ করলেন। পরবর্তী সময় ২ নং সেক্টরে মেজর খালেদ মোশাররফের অধীনে সংগঠিত হয়ে এবং আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অন্যদের সাথে তারাও মুক্তিযুদ্ধে সার্থকভাবে অংশগ্রহণ করেন।

তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ যুদ্ধের কারণ হলো এই যে, সুদীর্ঘ স্বাধিকার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু পুরো জাতিকে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। ২৫ মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ঢাকা ও চট্টগ্রাম সহ সমগ্র বাংলাদেশেই বাঙালিদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, মেতে উঠেছিল নির্মম হত্যাযজ্ঞে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তখন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত পাকিস্তানি আর্মির বাঙালি সদস্য, বাঙালি পুলিশ, ই. পি. আর., আনসার, মুজাহিদ, ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক-জনতা সকলেই যে যেখানে ছিল সে সেখানেই সম্মিলিতভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে "যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেছিল"। শুরু হয়ে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। এজন্য কাউকে আলাদা করে আবার ডাক দিতে হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের এ পর্যায়কে প্রতিরোধ যুদ্ধ বলা যায়, যা ছিল

সংক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত। এতে কোনো সমন্বয় বা একক নেতৃত্ব বা কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো কমান্ড ছিল না। পরবর্তী সময় ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের আম্রকাননে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা। গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর প্রবাসী সরকার কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানীকে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড-ইন-চিফ হিসেবে নিযুক্ত করে এবং সামরিক দিক দিয়ে পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে। এরপর সরকার যখন ১১টি সেক্টরে ১০ জন সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ দেয়, তখনই ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হতে শুরু করে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জিত হয়, অভ্যুদয় হয় বঙ্গবন্ধুর ও বাঙালির আজন্ম লালিত স্বপ্ন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

তখন আমি ছিলাম চিটাগাং ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতির দ্বিতীয় বর্ষ সম্মানের ছাত্র। একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ১১ দফা আন্দোলন সহ স্বাধিকার আন্দোলনে নিবেদিত ও স্পর্ধিত যৌবনের এক উদ্দীপ্ত যুবক ছিলাম আমি। পাকিস্তান নামক দেশটিতে তথা ফাঁকিস্তানে গণতন্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সামরিকতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত পূর্ব বাংলায় তখন ছিল উত্তাল গণ জোয়ার। লাখো লাখো প্রতিবাদী কণ্ঠের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। পাকিস্তানি নির্মম সামরিক শাসন, রক্ত-চক্ষু, দুঃশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী একজন সচেতন বাঙালি যুবক এবং একজন স্বাধিকার সংগ্রামী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য যে উত্তেজনা ও ছটফটানি সেদিন আমাকে অস্থির করে তুলেছিল সে আবেগের আজ আর কিছুতেই ভাষায় মূর্ত করে তোলা সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ও স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত প্রসঙ্গ

ভয়ানক টেনশন ও দুশ্চিন্তায় কেটে গেল ২৫ মার্চের দিবাগত রাত। এল ২৬শে মার্চ। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশের কোনো খবরই পাচ্ছি না। বঙ্গবন্ধু কোথায় আছেন, কী অবস্থায় আছেন, কী করছেন এসব জানার জন্য প্রাণ ছটফট করছে। আজকের প্রখ্যাত মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী, পরিচালক, নাট্যকার এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব লাকী ইনাম আমার ভাগনী। তাদের কুমিল্লার বাসায় ছিল পুরনো দিনের ইয়া বড় এক ফিলিপস্ রেডিও। খুব পাওয়ারফুল। লাকীসহ ধীরে ধীরে রেডিওর নব ঘুরাচ্ছি, যদি কোনো দেশের কোনো বেতার কেন্দ্র থেকে ঢাকার প্রকৃত অবস্থা জানার সুযোগ পাই। তখন আনুমানিক সকাল সাড়ে এগারোটা। রেডিওর নব আমরা ঘুরিয়েই চলেছি। হঠাৎ তড়িতাহতের মতো আমরা চমকে উঠলাম। রেডিও থেকে হঠাৎ ঘোষণা এল :"স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী

বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অক্ষত অবস্থায় বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। তারই নির্দেশে..."। আর শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। চোখ থেকে আনন্দ ও বেদনার অশ্রু নেমে এল। বঙ্গবন্ধু অন্তত বেঁচে আছেন ! এর এক দেড় মিনিট পর ভেসে এল "কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট" জাতীয় পর পর অনেকগুলো দেশাত্মবোধক গান। গানের ফাঁকে ফাঁকে রাজনৈতিক, ছাত্র, যুবক, শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে নাম-না-জানা অনেকের কণ্ঠেই পাকিস্তানি জল্লাদদের বর্বরতার কাহিনি, বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আহবান শুনলাম। যাদের কাছে সামরিক বা বেসামরিক আগ্নেয়াস্ত্র আছে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্রসহ লালদিঘি ময়দানে জড়ো হওয়ার জন্য ঘোষকরা আহ্বান জানাতে থাকেন। উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ সুসংগঠিত করা। পরে অবশ্য পাকিস্তানিদের দ্বারা বিমান হামলার সম্ভাবনা এবং নিরাপত্তার কারণে সে পরিকল্পনা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। দুপুর আনুমানিক আড়াইটার দিকে আওয়ামী লীগের চট্টগ্রাম জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবদুল হান্নান তাঁর ভরাট ও দরাজ গলায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিলেন। এতে আমরা আরো উদ্দীপ্ত হলাম। এভাবে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিতেই থাকলেন। মাঝে-মাঝে অবশ্য সম্প্রচার বন্ধ থাকছিল এবং কখনোবা দুর্বল ও ভুলে ভরা ইংরেজিতেও স্বাধীনতার ঘোষণা জারি হচ্ছিল। এভাবেই চলে গেল ২৬ মার্চ। এল ২৭ মার্চ। বিকেলের দিকে একজন ঘোষক হঠাৎ ঘোষণা করলেন যে এবার স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন মেজর জিয়াউর রহমান। কিন্তু কোনো ঘোষণা এল না। শুধু ভুট-ভাট-ফুট-ফাট ধরনের আওয়াজ এল। তারপর হঠাৎ ভেসে এল একটার পর একটা দেশাত্মবোধক গান। মাগরেবের নামাজের কিছুক্ষণ পর জিয়ার ঘোষণাটি এল I, Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim on behalf of our great leader Bangabandhu Sheikh Muzibur Rahman, the independence of Bangladesh..., The Government formed under Sheikh Muzibur Rahman is the sovereign and legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world". পরে মেজর জিয়া বাংলায়ও স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এভাবে : "আমি, মেজর জিয়া, আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।..." আর্মির একজন বাঙালি মেজরের কণ্ঠে চমৎকার ভাষায় স্বাধীনতার এ ঘোষণায় সকলেই আমরা আরো উজ্জীবিত হলাম। মুক্তিযুদ্ধ হলো আরো বেগবান।

মেজর জিয়ার আগেই জানা-অজানা অনেকেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নানও করেছিলেন, মেজর জিয়াও করেছিলেন। আবদুল হান্নান করেছিলেন আগে, মেজর জিয়া করেছিলেন পরে। আবদুল হান্নান ছিলেন রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি এবং বেশ পরিচিত। মেজর জিয়া সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন এবং তাই মেজর পদমর্যাদার এই অফিসারকে আমরা কেউই তখন চিনতাম না। এরা যদি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ নাও করতেন তাহলেও স্বাধীনতা হতো এবং বাংলাদেশও স্বাধীন হতো। মনে রাখতে হবে, এঁদের ঘোষণার বেশ আগেই, আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই স্বতঃস্ফূর্তভাবেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সকলেই বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, তাছাড়া বঙ্গবন্ধুর পক্ষে না হলে ওই সময় ঐ ঘোষণার কোনো মূল্যই হতো না। কেননা অনির্বাচিত কোনো ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণার কোনো যুক্তিপূর্ণ, নৈতিক ও আইনগত অধিকার ছিল না। এ অধিকার শুধু ছিল জনগণের দ্বারা বিপুল ভোটে নির্বাচিত সংসদে মেজরিটি দলের নেতা এবং জনগণের মেন্ডেট প্রাপ্ত বাঙালি ও বাংলার অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বিকেলে এবং ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে সেই দায়িত্বই পালন করেছিলেন। জননেতা আবদুল হান্নান ও মেজর জিয়াও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা কেউই নিজে সরাসরি নিজের পক্ষে বা নিজের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি, কেননা সে অধিকার তাদের ছিল না। তারা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে এবং বঙ্গবন্ধুর নামেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন। এটিই ঐতিহাসিক সত্য। জননেতা আবদুল হান্নান এবং মেজর জিয়ার ঘোষণা রেকর্ড করা আছে। রেকর্ডগুলো অবিকৃত অবস্থায় বাজিয়ে শুনলেই আমার বক্তব্য যে সত্য তা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তবে এটিও সত্য যে, ওই মুহূর্তে স্বাধীনতার ওই দুটো ঘোষণা পাঠ স্বাধীনতা যুদ্ধকে সুসংগঠিত করার বিরাট ভূমিকা রেখেছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কেন এতো হীনমন্যতা ? জননেতা আবদুল হান্নান ঘোষণা আগে দিয়েছিলেন এবং মেজর জিয়া পরে দিয়েছিলেন বলেই কি চট্টগ্রাম বিমান বন্দরের নাম "আবদুল হান্নান আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর" মুছে দিয়ে "হযরত আমানত শাহ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর" রাখতে হবে, তাও আবার একজন বুজুর্গ ব্যক্তির নামে, যাতে ইসলামি আবেগে আঘাত আসতে পারে এই ভয়ে প্রতিপক্ষ নতুন নামটি বাতিল করে আবদুল হান্নান নামটি পুনরায় প্রতিস্থাপিত করতে না পারে ? ফল হলো কী? প্রথম পক্ষের চালাকি থেকে 'শিক্ষা' নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষও ঢাকা বিমান বন্দরের নাম "জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর" পালটিয়ে নতুন নাম দিল "হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর !"

এতে কার কী লাভ হলো ? একপক্ষ জননেতা আবদুল হান্নানের নাম মুছে দিল বলে অন্য পক্ষ মেজর জিয়ার নামও মুছে দিল। নাম থাকুক আর নাই থাকুক, প্রকৃত সত্য হলো, হান্নান ও জিয়া দু'জনই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন, জনাব হান্নান পাঠ করেছিলেন ২৬ মার্চ এবং মেজর জিয়া পাঠ করেছিলেন ২৭ মার্চ এবং দু'জনেই স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধুর নামে। তাই কবির কাব্য একটু পরিবর্তন করে বলতে চাই "সবার উপরে বঙ্গবন্ধু, তাহার উপরে নাই"!

কুমিল্লা টু ফেনী : এ জার্নি বাই রিকশা

কয়েকদিন ধরে কুমিল্লা শহরে পাকি হানাদার বাহিনীকে টহলরত অবস্থায় দেখলাম আর বুঝলাম যে লাঠি-বল্লম দিয়ে, ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে অথবা ব্যারিকেড দিয়ে আর যাই হোক অন্তত এদেশ থেকে এ জালিমদেরকে তাড়ানো যাবে না। এদের মুখোমুখি হতে হলে সামরিক ট্রেনিং চাই, চাই আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র। প্রচণ্ড আবেগ, মানসিক অস্থিরতা এবং শত্রু-সেনাদের মোকাবিলা করে দেশকে হানাদারমুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এক নিঝুম সন্ধ্যায় বেরিয়ে পড়লাম বাসা থেকে। অসংখ্য বাড়ির দেয়াল টপকিয়ে এবং হায়েনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে অবশেষে শহর থেকে বের হতে পারলাম। পৌঁছলাম গোমতী নদীর তীরে এবং সব শেষে সোনামুড়া বর্ডার হয়ে ভারতের মাটিতে। অগণিত শরণার্থী দলে দলে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছে নিরাপদ আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। ভারতের জনগণ তাদের জন্য খুলেছে অসংখ্য অভ্যর্থনা কেন্দ্র। চিড়া-মুড়ি-কলা খেয়ে তেমনি এক অভ্যর্থনা কেন্দ্রে রাত কাটালাম। পরদিন সকালে খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম যে, কুমিল্লার দেবীদ্বার এলাকা থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমএনএ ক্যাপ্টেন (অব.) সুজাত আলী সাহেব ত্রিপুরা রাজ্যের উদয়পুর শহরের নিকটবর্তী পালাটানা নামক স্থানে সহসাই একটি ট্রেনিং ক্যাম্প খুলবেন। পালাটানা ট্রেনিং ক্যাম্পের ঠিকানা জোগাড় করা গেল। মা আমার বড় বোনের বাড়িতে নিরাপদেই থাকবেন। কিন্তু ট্রেনিং তথা যুদ্ধ-যাত্রার পূর্বে এবং স্বদেশের তরে নিজের জীবনটি দান করার পূর্বে মাকে সালাম করার এবং এক নজর দেখার জন্য প্রাণে দারুণ অস্থিরতা বোধ করলাম। সুতরাং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আবার ফিরে গেলাম কুমিল্লা শহরে, বোনের বাড়িতে। আমার মা, ভগ্নিপতি ও ভাগিনা-ভাগনী সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। অনেক উৎসাহ আর উত্তেজনার সাথে তারা আমার পকেটে করে নিয়ে যাওয়া ভারতীয় মুদ্রা দেখলো এবং মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার আমার সিদ্ধান্তের কথাটি শুনলেন। কিন্তু একটি কারণে মিঞাভাই (আমাদের বড় ভগ্নিপতিকে আমরা মিঞাভাই বলেই ডাকি) অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। কারণ তার মতে ভারতীয় মুদ্রাসহ পাক সেনাদের হাতে ধরা পড়লে আমাকে যেমনি হত্যা করা হতো তেমনি আমার বড়

বোনের পুরো পরিবারই ভয়াবহ বিপদ ও ধ্বংসের সম্মুখীন হতে পারতো। —তাই তো ! নিজের বোকামোপনায় নিজে খুবই লজ্জিত হলাম। মিঞাভাই অত্যন্ত রাগত স্বরে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তার বাড়ি ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন। আমি অবশ্য ওই মুহূর্তেই চলে যেতে চাইলাম। কিন্তু উনি বাধা দিলেন এবং পরদিন 'মা'কেসহ নিয়ে যেতে বললেন। তার ধারণা, যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই আমি মায়ের টানে তার বাসায় আসবো এবং সবার জন্য বিপদ সৃষ্টি করবো। তাকে আশ্বস্ত করে বললাম যে, যুদ্ধে হয় আমি শহীদ হবো, না হয় শুধু বিজয়ী হয়ে তবেই ফিরে আসবো। কিন্তু উনি ওনার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। মিঞাভাইয়ের কঠোর-কঠিন সিদ্ধান্তে পরিবারের সবাই নিশ্চুপ রইলেন। বেশ অসহায় বোধ করলাম। অস্বস্তিকর রাতটি বড় কষ্টে অতিবাহিত করলাম। এ বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে মাকে নিয়ে কোথায় যাই ? এ ঘটনায় আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান কিছুটা হলেও বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলো। ঠিক করলাম, মাকে নিয়ে ফেনীর বর্তমান ফুলগাজী থানাধীন দরবারপুর গ্রামের নিজ বাড়িতেই চলে যাব। কিন্তু যাব কীভাবে ? বিক্ষুব্ধ জনতা বহু স্থানেই রেললাইন উপড়ে ফেলেছে। তাই রেল চলাচল বন্ধ। ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওয়ের অনেক ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা। বিশাল বিশাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে রাস্তায় বারিকেড তৈরি করে রেখেছে প্রতিবাদী জনতা। সুতরাং বাস চলাচল বন্ধ। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল— একটি রিকশা। নতুন রিকশা। চালক সুঠাম দেহের কালো কুচকুচে ও তেলতেলে শরীরের ও এক তাগড়া যুবক। আমার মা বড়ই স্বল্পভাষী, বড় বেশি সহজ-সরল মহিয়সী অনন্যাসাধারণ এক মা। অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত এ পরিস্থিতিতে তিনি খুবই বিব্রত। সকাল সাড়ে আটটায় আমাদের বিপদসংকুল রিকশা-যাত্রা শুরু হলো। অশ্রুসিক্ত এবং নিঃশব্দে বিদায়ের এ করুণ দৃশ্যটি আমার ঘটনাবহুল জীবনের একটি সকরুণ অধ্যায় হয়ে রইলো।

ছোটরা হতে শহরের বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে কান্দিরপাড়, মনোহরপুর, চৌমুহনী মোড়, চকবাজার হয়ে শহর থেকে বের হয়ে ফেনীর পথে ডানে মোড় নিলো রিকশা। কিন্তু মোড়ের বাম দিকের পেট্রোল পাম্পের দিক হতে হঠাৎ উদিত হয়ে ৫/৬ জন পাকি আর্মি আমাদের রিকশার গতি রোধ করে দাঁড়ালো এবং উন্মুক্ত বেয়নেটসহ চাইনিজ রাইফেল ঠেঁসে ধরলো আমার কণ্ঠনালি বরাবর। মা অনুচ্চ কণ্ঠে সূরা 'আর-রহমান' ও 'সূরা ইয়াসীন' তেলাওয়াত শুরু করলেন। কণ্ঠনালির উপর বেয়নেটের চাপ ক্রমেই বাড়ছে। নেমে আসছে রক্তের ক্ষীণ একটি ধারা। সম্ভাব্য অসহায় এবং অর্থহীন মৃত্যুর জন্য আমি প্রস্তুত হয়ে গেলাম। কিন্তু কল্পনাতীত রকমের কষ্ট হচ্ছিল শুধু এই ভেবে যে, এ স্থানে এ পরিস্থিতিতে আমার মৃত্যুর পর আমার মা'র কী হবে। কিন্তু উদ্ধত ও নিষ্ঠুর পাকি সেনাদের মধ্যে একজনকে কেমন জানি একটু ভিন্ন রকম মনে হলো। তিনি এগিয়ে এলেন এবং

আমার দিকে অনুসন্ধিৎসু ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি তাঁকে 'আসসালামু আলাইকুম' বললাম। 'ওয়ালাইকুম সালাম' বলে উনি এবার অত্যন্ত সম্মানের সাথে 'মা'র দিকে তাকালেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন, সঙ্গিনধারীকে নিবৃত্ত করলেন এবং আমাদেরকে চলে যেতে বললেন। জমে থাকা নিশ্বাস ফোঁস করে বেরিয়ে এল আমার বুক থেকে। রিকশা আবার চলতে লাগলো উল্কার মতো তীব্র গতিতে।

পথিমধ্যে অসংখ্য ব্যারিকেড এবং ভাঙা ব্রিজ পাওয়া গেল। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় সেসব বাধা অতিক্রম করে এবং নৌকায় করে রিকশাসহ নদী পার হয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। কিন্তু যে বিষয়টি আমাকে হতবাক করে দিলো তা হলো, শত শত পরিবারের হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা এবং শিশু হাতে ও মাথায় ব্যাগ-স্যুটকেস-গাট্টি-বোঁচ্‌কাসহ ধীর পাঁয়ে ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে হাইওয়ে ধরে দক্ষিণ দিকে। সে এক অবিশ্বাস্য রকমের সুদীর্ঘ মানব কাফেলা ! আলাপ করে জানা গেল, এদের বেশিরভাগই ঢাকা হতে কুমিল্লার দক্ষিণাংশ, ফেনী, নোয়াখালী অথবা চট্টগ্রামের পথ-যাত্রী। ঢাকায় হানাদার দস্যুদের নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ হতে পলায়নরত এসব পরিবারের মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত-স্বচ্ছল-অস্বচ্ছল সব ধরনের মানুষই ছিল। কিন্তু আজ সবাই একাকার। প্রিয় শহর ঢাকা আজ তাদের কাছে বিভীষিকাময় এক নরকপুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। সেখান থেকে এরা কোনো রকমে বেরিয়ে এসেছে, ছুটে চলেছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে, শেকড়ের সন্ধানে। সেই অবহেলিত গ্রামীণ জনপদের দিকে তারা অগ্রসরমান, যেখানে এই চলমান বিশাল কাফেলার অধিকাংশ মানুষই হয়তো তাদের শিশু ও কৈশোর কাল কাটিয়ে ছিল, তারপর ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়েছিল সেই মূল শিঁকড়ের কথা, নগর সভ্যতার অমোঘ আকর্ষণে। কিন্তু সেই অবহেলিত গ্রামই হতে যাচ্ছে আজ তাদের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

আরেকটি অবাক ব্যাপার হলো এই যে, কিছুদূর পরপরই গ্রামের জনগণ এই অসহায়, অচেনা ও ক্লান্ত পথিকদের জন্য সামিয়ানা টাঙিয়ে বিশ্রামের ও আতিথেয়তার ব্যবস্থা করে রেখেছে। পানীয় জল, চিড়া-মুড়ি-খই-গুড় দিয়ে আপ্যায়ন করছে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটে-চলা এই অসহায় বাঙালিদের। তাল-পাতার হৃদয়-কাড়া মনোরম ডিজাইনে তৈরি হাত পাখা দিয়ে করছে বাতাস। বেড়া দিঁয়ে তৈরি অস্থায়ী টয়লেট ও প্রস্রাবখানাগুলো মা-বোন-বৌদের জন্য যে কতখানি প্রয়োজনীয় ছিল তা আজ আর লিখে বুঝানো যাবে না। রাস্তার পাশের এ ধরনের অস্থায়ী "সরাইখানায়" আমরাও বেশ কয়েকবার আপ্যায়িত হলাম আর অবাক বিস্ময়ে, তৃপ্তিতে ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হলাম।

২০১৪ সালের শুরুতে এসে তাই আজ বারে বারে মনে পড়ে ১৯৭১ সালের সেই সব আবেগমথিত দিনগুলোর কথা যখন সমগ্র জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে

অনুপ্রাণিত, স্বাধিকার তথা স্বাধীনতার প্রশ্নে ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়তায় একতাবদ্ধ, মানবিকতায়-ভ্রাতৃত্ববোধে-সহমর্মিতায় ছিল সমৃদ্ধ। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ চোখে পড়ে ঠিক তার বিপরীত চিত্র। প্রাণে তাই বড় কষ্ট পাই।

ফেনী তখনো মুক্তিযোদ্ধাদের তথা জনতার নিয়ন্ত্রণে। ফেনী শহরের প্রবেশ-মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের চেক-পোস্ট এবং সামরিক প্রস্তুতি দেখে উল্লসিত হলাম। ফেনীর সর্বজন শ্রদ্ধেয়, নিঃস্বার্থ ও অবিসংবাদিত চিরকুমার জননেতা, আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য জন্মভিটা খাজা আহমেদ তখন সার্থকভাবে ফেনীতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সংগঠিত করছিলেন। মধ্য রাত্রির পর বাড়ি এসে পৌঁছালাম। এটাই আমাদের। রিকশাওয়ালার খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করে মা ও আমি বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। অশান্ত মন শান্ত হয়ে এল, প্রশান্তিতে জুড়িয়ে গেল প্রাণ। মুহূর্তের মধ্যেই তলিয়ে গেলাম গভীর নিদ্রায়।

দেশকে রাহুমুক্ত করতে হবে, হটিয়ে দিতে হবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে, আনতে হবে প্রত্যাশিত স্বাধীনতা - এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে পরদিন সকাল থেকেই শুরু হলো আমার যুদ্ধযাত্রার।

গোলাম মুস্তাফা

জন্ম : ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০, ফেনী। আলী আজম হাই স্কুল, ফেনী কলেজ হয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ এমএ। গর্বিত রোটারিয়ান গোলাম মুস্তাফা মানুষকে ভালোবেসে সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট।
একাত্তরে গোলাম মুস্তাফা। ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এর সাথে গণযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেন। কমান্ডিং অফিসারের স্টাফ অফিসার ও পাইওনিয়ার প্লাটুনের একাংশের কমান্ডার হিসেবে রণাঙ্গনে বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন।
তার *ফেনী বিলোনিয়া-রণাঙ্গনে এক প্রান্তর* এবং *যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি* বই দুটি আমাদের যুদ্ধ সাহিত্যের অনন্য সংযোজন।

মুহূর্তেই ধ্বংস হলো রেলগাড়ি

এ কে এম জয়নুল আবেদিন খান, বীর প্রতীক

ঢাকার ছেলেদের নিয়ে একটা আলফা কোম্পানি করা হয়। আলফা কোম্পানিকে কয়েকটি প্লাটুনে ভাগ করা হলো। জামান ভাইকে কোম্পানি কমান্ডার, কোম্পানির সেকেন্ড ইন কমান্ড (টু আই সি) করা হলো শাহাজান ভাইকে। আর ঢাকার ছেলেদের নিয়ে করা হলো ১ নম্বর প্লাটুন। তার সেই প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওম্পী ক্যাম্পে থাকাকালীন আমার ডায়রিয়া দেখা দেয়। তখন খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। আশপাশে কোনো ডাক্তার ছিল না। আমার প্লাটুনের ছেলেরা খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে রাতটা কাটায়। হারুন নামে একজন সারা রাত আমারে সেবাযত্ন করে। পরের দিন সকালে ক্যাপ্টেন সাক্সেনা গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সাত-আট দিন হাসপাতালে থেকে আবার ওম্পী ক্যাম্পে ফিরে আসি। আমার অবর্তমানে কমান্ডার ছিলেন কাশেম। ১৯৬৯ সালের ১১ দফার আন্দোলনের সময় রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের কঠিন নিয়মশৃঙ্খলার জন্য সভা, মিছিল ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারিনি কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে লুকিয়ে হোস্টেলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কার হই। ৬ জুন, ১৯৭১ সালে বিদায় হলাম ওম্পী ক্যাম্প থেকে, মেলাঘর ক্যাম্পে আমরা অবস্থান করি। সেখানে ছোট ছোট দু-একটা দলকে গেরিলা যুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। একদিন আমি ঢাকায় যুদ্ধ অপারেশনের জন্য দল গঠন করার জন্য জহিরুল ইসলামকে প্রস্তাব দিই। তিনি রাজি হওয়ার পর ক্যাপ্টেন হায়দারকে রাজি করাই। বললাম, আমাদের দলটা হবে ছোট। ১০ জনের বেশি হবে না। কাউকে জানানোর দরকার নেই। আমাদের দলে ১০ জন হলো জহির, সালাম, আহম্মদ (আদি), ফারুক, আসাদ, ইসহাক, মোবারক, মবিন ও সামসুল।

দল চূড়ান্ত হওয়ার পর আমার কাছে একটা খবর এল। খবরটা হলো একসময় আমি কর্নেল আবদুর রব আর্মি কমিশন্ড র‍্যাংকে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তার রেজাল্ট আসে যে আমি চান্স পেয়েছি। এত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর দল গঠন করে যুদ্ধে যাব এমন সময় এই খবরটা সবাইকে ভারাক্রান্ত করে ফেলে। আমি আর্মি কমিশনার র‍্যাংকে চলে যাই—এটা কেউ মেনে

নিতে পারছিল না। আমি অনেক ভেবে ঠিক করি—দেশকে স্বাধীন করতে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি। ট্রেনিং শেষ। এখন যুদ্ধ করার পালা। দেশ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অফিসার হব, এটা শুনে অনেক খুশি হয়েছিলাম কিন্তু দেশের দিকে তাকিয়ে আর অগ্রসর হলাম না। এ কথা শুনে সবার মুখে আনন্দের আলো জ্বলে ওঠে। তারপর ঢাকার পথে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য বের হয়ে পড়ি। ১৯৭১ সালের শেষ দিক। রাতে গোপন শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ি একদল মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে। বেশিরভাগ স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। জলপথে নৌকায় করে পৌঁছাই লক্ষ্যস্থলে। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের পুবাইল-আড়িখোলা রেলস্টেশনের মাঝামাঝি এক স্থানে। সেখানে আছে ছোট একটি রেলসেতু। রেলপথের দুই পাশের বেশিরভাগ স্থান জলমগ্ন। সেতুর দক্ষিণে একটি বটগাছ ও বিরাট পাটক্ষেত। বেশ দূরে একটি গ্রাম। রেলপথের আশপাশ জনমানবহীন। দু-তিন ঘণ্টা পরপর ট্রেন চলাচলের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মুক্তিযোদ্ধাদের অপারেশনের জন্য উপযুক্ত স্থান। একটু আগে গেছে একটি রেলগাড়ি। দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে আর রেলগাড়ি আসার সম্ভাবনা নেই। পরিকল্পনা অনুসারে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত শুরু করলেন তাদের কাজ। আমিসহ কয়েকজন থাকলাম অপারেশনস্থলে। বাকিরা বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নিলেন কাট অব পার্টি হিসেবে। বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধারা রেল স্লিপারের নিচের পাথর সরিয়ে বসাই নিয়ন্ত্রিত মাইন। এক ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হলো কাজ। মাইনের সঙ্গে তার লাগিয়ে তা টেনে নিলাম কাছাকাছি নিরাপদ স্থান পর্যন্ত। আমরা অবস্থান নিলাম সেখানে।

এবার রেলগাড়ির জন্য অপেক্ষার পালা। তারপর সময় গড়াতে থাকে আমরা তার টেনে অবস্থান নিয়েছিলাম একটা পুকুরের পাড়ে। চারদিকে পানি। শুধু পাড়টাই শুকনো। সেখানে পোকামাকড়ের দংশনে সবাই অতিষ্ঠ। আমি আবার অসুস্থ হয়ে গেলাম। এদিকে রাত শেষে ভোর হয়। কিন্তু ট্রেনের আর দেখা নেই। আমরা চিন্তিত হয়ে পড়লাম। কারণ, যত বেলা হবে, আমাদের অবস্থান সেখানে বিপজ্জনক হয়ে পড়বে। এমন সময় ট্রেনের হুইসেলের শব্দ। তখন আনুমানিক সকাল ছয়টা। কিছুক্ষণের মধ্যেই রেলগাড়ি দৃষ্টিগোচর হলো। মুক্তিযোদ্ধাদের বিস্ফোরক দল প্রস্তুতই ছিল। সবাই অধীর উত্তেজনায়। অপেক্ষা করছেন রেলগাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে আসার জন্য। ইঞ্জিনের সামনে বালুভর্তি ওয়াগন। বালুভর্তি ওয়াগন চিহ্নিত স্থান অতিক্রম করামাত্র বিস্ফোরক দল মাইনের বিস্ফোরণ ঘটালেন। বিকট শব্দে গোটা এলাকা প্রকম্পিত। কালো ধোঁয়া ও জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড উপরের দিকে উঠতে লাগল। ইঞ্জিন ও পেছনের কয়েকটি বগি মাইনের বিস্ফোরণে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত। ইঞ্জিন ও দুটি বগি সম্পূর্ণ ধ্বংস। সেগুলো রেলপথ থেকে ছিটকে নিচে পড়ে। ইঞ্জিনের পরের বগিতে ছিল পাকিস্তানি সেনা। তারা বেশিরভাগ হতাহত। অপারেশন শেষে মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন নিরাপদ স্থানে।

এই রকমে কয়েকটা অপারেশন আমরা করি। তবে এটার প্রভাব অনেক পড়েছিল।

এক সময় আমার প্লাটুনে দিনে দিনে সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে তখন খাবার সমস্যা দেখা দেয়। ৬০ জনের দুই বেলা খাবার ও নাশতা সংগ্রহ করতে নাভিশ্বাস ওঠার মতো অবস্থা। অর্থ ও খাবার সংগ্রহের দায়িত্ব নিলাম আমি। বাতুলিয়ার নুরুল ইসলাম বাটায় চাকরি করতেন। তাই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সু কোম্পানির ম্যানেজার ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ডের (খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা। তাঁকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক)। আমার সঙ্গে নুরুল ইসলামের যোগাযোগের কারণে ওডারল্যান্ডের সাথে দেখা হয়। তিনি একবার ও তাঁর কোম্পানির কর্মচারীরা আমাদের সাহায্য দিয়েছিলেন। আমাদের অনেক উৎসাহ দিতেন। একদিন আমাকে বললেন, তুমি কী চাও? আমি বললাম আমি তেমন কিছু চাই না। অপারেশন করার সময় যদি ধরা পড়ে যাই তখন তো আমাকে নানা প্রশ্ন করবে। এ থেকে রেহাই পেতে আমি পটাশিয়াম সালফেট খেয়ে আত্মবিসর্জন দেব। তাই আপনি আমাকে পটাশিয়াম সালফেট দেন। অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকলেন।

ওডারল্যান্ড আমাদের তাঁর নিজের পিস্তলটি দেন। সেটা আমি সেই সময়ে ব্যবহার করি।

১৯৭১ সালে ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। পাকিস্তানের করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত অবস্থায় শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। ২১ এপ্রিল সেখান থেকে কৌশলে দেশে আসি। কয়েকদিন পর ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিই। প্রশিক্ষণ শেষে ২ নম্বর সেক্টরে বৃহত্তর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গেরিলা যুদ্ধ করি। ছিলাম প্লাটুন কমান্ডার।

এ কে এম জয়নুল আবেদিন খান, বীর প্রতীক

দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিই

তাহের আহমেদ, বীর প্রতীক

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সারা রাত ধরে সমগ্র ঢাকা শহরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞের তাণ্ডবলীলার স্মৃতি এখনো আমাকে মানসিকভাবে প্রচণ্ড বিচলিত করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে আমার পৈত্রিক বাসস্থান মাত্র এক কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত। ৩ মার্চ থেকে বাসাবো মাঠে আমরা ২০-২১ জন প্রত্যয়ী বন্ধু মিলে পিএমএ থেকে সদ্য বাদপড়া একজন বাঙালি ক্যাডেটের তত্ত্বাবধানে নিয়মিত প্রতি সন্ধ্যায় গেরিলা যুদ্ধের বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করছিলাম। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল, 'ইয়াহিয়া-মুজিব' আলোচনা ব্যর্থ হলে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে মাতৃভূমি স্বাধীন করব।

উত্তাল মার্চের দিনগুলোতে এমনি একটি প্রত্যয়ী লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে যেতে নিজেকে উত্তরোত্তর সাহসী এবং দৃঢ়চিত্তের অধিকারী মনে হতে লাগল। ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় ডেমরা এলাকায় অ্যামবুশের মহড়া শেষ করে রাত পৌনে ১০টার দিকে বাসাবো মাঠে ফিরে এসে লক্ষ্য করলাম সমগ্র এলাকা কেমন যেন এক অসহনীয় থমথমে ভাব এবং এলাকার সব লোকজন দ্রুত যার যার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। ঠিক যেন এক প্রলয়ের পূর্বাভাস। রাত সোয়া ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে পশ্চিম দিকে খুব কাছ থেকে প্রথম এক ঝাঁক গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হলো রাজারবাগ পুলিশ লাইনের দিক থেকে শব্দের উৎপত্তি। বন্ধুরা কয়েকজন মিলে সাহস সঞ্চয় করে ঠিক করলাম সতর্কতার সঙ্গে খিলগাঁও রেল ক্রসিংয়ের কাছে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করব। ইতোমধ্যে গোলাগুলির প্রচণ্ডতা ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে। শাহজাহানপুর থেকে দৌড়ে ছুটে আসা দু-একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম পুলিশ লাইনকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখে পাকিস্তানি সেনারা লাইনের ভেতর প্রতিরোধরত বাঙালি পুলিশ সদস্যদের ওপর ভারী অস্ত্র থেকে গুলি করছে এবং শহরের অন্যান্য এলাকায়ও যথা পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানে একইভাবে পাকিস্তানি হায়েনারা বর্বর আক্রমণ শুরু করেছে। দ্রুত বাসায় ফিরে এলাম। মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমাদের (সাত ভাইবোন) নিয়ে বাড়ির উঠানের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ময়লা ফেলার গর্তে দ্রুত

আশ্রয় নিলেন এবং সবাইকে উচ্চৈস্বরে দোয়া পাঠ করতে বলেন। ২৫ মার্চের কয়েকদিন আগে থেকে আমার বাবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী। রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ওপর গোলাগুলির কিছু অংশ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আমাদের বাসার আশপাশে পড়তে লাগল। আশ্রয় নেওয়া সেই ময়লার গর্ত থেকে হতাশা ও আতঙ্কে ক্রমশ উপলব্ধি করতে লাগলাম যে উত্তাল মার্চের প্রথম দিনগুলোতে একটু একটু করে সঞ্চিত সাহস এবং চিত্তের দৃঢ়তা যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে যাচ্ছে। একসময় মাকে আঁকড়ে ধরলাম হারিয়ে যাওয়া সাহস ফিরে পাওয়ার জন্য। কিন্তু হতাশা ও ক্ষোভে আমার মাও কাঁদছেন এবং কাঁপছেন। অস্পষ্ট গলায় বলেন, 'বাবা, আমাদের বুঝি সবই শেষ হয়ে গেল।' পরদিন অর্থাৎ ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় বাসাবো মাঠের কোণে একটি রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এবং প্রধান সামরিক শাসক জেনারেল টিক্কা খানের দম্ভভরা ভাষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। মূলত পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালিদের চিরতরে দমন করে রেখে পাকিস্তানে শুধু দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখার তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ সেই ভাষণই আমার মনকে তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে আর একত্রে না থাকার জন্য চূড়ান্তভাবে বিদ্রোহী করে তোলে। তখনই ঠিক করলাম যদি কোনো সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়, আমি তাতে যোগ দেবই। হয় স্বাধীন, না হয় মৃত্যু। বাসায় গিয়ে মাকে আমার মনের অবস্থা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে প্রবল এক আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আবারও কেঁদে ফেললেন। কিন্তু আমার বড় ভাই তহুরুর রহমান সে কথা শুনে বলেন, 'আমাদের চারপাশ অবাঙালি দ্বারা পরিবেষ্টিত। তুমি সে রকম কোনো সিদ্ধান্ত নিলে ওরা আমাদের পুরো পরিবারকে মেরে ফেলবে।' কিন্তু মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে শুরু করলে তাকে কে নেভায়! ঠিক করলাম অসুস্থ পিতাকে হাসপাতাল থেকে এনে বড় ভাই ছাড়া (তিনি ব্যাংকে চাকরি করতেন) মা, বাবা এবং ছোট ভাইবোনদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে (নোয়াখালীর চাটখিল থানার অন্তর্গত) রেখে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেব।

২৭ মার্চ বিকেলে আমরা ঢাকার বাসাবোর বাসা ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পূর্বদিকমুখী শত-সহস্র মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে মাদারটেক হয়ে মাধবদীর এক বাড়ির উদ্দেশে প্রাথমিক যাত্রা শুরু করি। অসুস্থ বাবার কারণে আমরা মাত্র বাসাবো সংলগ্ন মাদারটেক পর্যন্ত যেতে পেরেছিলাম রাত সাড়ে ১০টায়। সেখানে আমরা ছাড়াও আরও অনেক নারী-পুরুষ ও শিশু ছিল। অচেনা এক অবস্থাপন্ন কৃষক আমাদের সবাইকে আগ্রহভরে রাতের খাবার ও আশ্রয় দেন। তাঁর সেই আতিথেয়তার জন্য হৃদয় নিংড়ানো কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। বস্তুত, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ওই কৃষকের মতো সারা দেশে বহু মানুষ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। সমগ্র জাতি তাঁদের সেই অবদানের জন্য চিরকৃতজ্ঞ।

রাত ১১টার দিকে আমি কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হৃদয়স্পর্শী এবং পরম কাঙ্ক্ষিত সেই বেতার ঘোষণা শুনতে পাই, 'I Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the Independence of Bangladesh.' উপস্থিত জনতার মধ্যে তখন আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে 'জয় বাংলা' মুহুর্মুহু উচ্চারিত হতে লাগল।

২৯ মার্চ ভোরে যাত্রা শুরু করে বেলাব ফেরিঘাট নৌকায় পার হয়ে রাত নয়টায় আমরা মাধবদীতে আমার খালাতো ভাই নেছার আহমেদের বন্ধু সামাদ সাহেবের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। সেখানে ১০-১২ দিন ছিলাম। ৭ এপ্রিল মাধবদী বাজারের কাছে ঢাকা-নরসিংদী রোডে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গলের একটি দল নরসিংদীর দিকে যাওয়া পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি কনভয়কে অ্যামবুশ করে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। গোলাগুলি থামলে আমরা বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা জানালাম এবং নিজে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য আরও উদ্বুদ্ধ হলাম। পরে মাধবদী (চাটখিল) ত্যাগ করে আশুগঞ্জ, চাঁদপুর ও রায়পুর হয়ে ২০ এপ্রিল নিজ গ্রাম নিজভাওর পৌঁছলাম। ইতোমধ্যে মা আমার মনোভাব সম্ভবত বুঝতে পেরে এক টাকার ১০০টি নোটের দুটি বান্ডিল আমার ব্যবহৃত ক্যারিয়ার ব্যাগের পকেটে ঢুকিয়ে রেখেছিলেন, যাতে তা যেন সহজে নজরে পড়ে। এ যেন মা ও ছেলের এক অদ্ভুত লুকোচুরি খেলা। একদিকে মাকে চলে যাওয়ার চূড়ান্ত মুহূর্তে বলে যেতে না পারার ছেলের সাহসের অভাব—কি জানি মা তাকে চিরতরে হারিয়ে ফেলার ভয়ে কিছু একটা করে বসেন—ওদিকে মা হয়তো ভাবছেন, তাঁর মানিক চলে যেতে চাইলে তিনি যদি তাকে আঁকড়ে ধরে রাখেন। এপ্রিলের ২৬ তারিখে নিজ গ্রাম ও আশপাশের ১৫-১৬ জন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু উৎসাহী তরুণকে নিয়ে দূর থেকে মাকে এক নজর শ্রদ্ধাভরে দেখে ভারতের উদ্দেশে রওনা হই।

১৯৭১ সালে আমি ঢাকা কলেজের বিএসসি শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলাম। এপ্রিল মাসে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ আমার শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি সেখানেই টেনে দিল। ভারতে গিয়ে ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে মেলাঘর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মেজর হায়দারের তত্ত্বাবধানে গেরিলাযুদ্ধের উপযোগী সব ধরনের কৌশলের প্রশিক্ষণ নিই। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এসে রাতের বেলায় শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করা ছিল এই প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য অংশ। অতঃপর জুন মাসের শেষ সপ্তাহে 'প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্স' নামের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সর্বপ্রথম কমিশন ট্রেনিং কোর্সে নির্বাচিত হই। ৬১ জনের প্রথম ব্যাচে ৯ অক্টোবর কমিশনপ্রাপ্ত হয়ে ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে 'ডালু' সাব সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হই। ১৬ অক্টোবর আমি আমার সাব সেক্টরের দায়িত্ব গ্রহণ করি।

হালুয়াঘাট থানার অন্তর্গত সীমান্তসংলগ্ন শক্তিশালী তেলিখালি ইপিআর ক্যাম্প আক্রমণ যুদ্ধ, নকলা থানা মুক্তিযুদ্ধ ও ময়মনসিংহ-জামালপুর রেল যোগাযোগ লাইনে মধ্যবর্তী বিদ্যাগঞ্জ-বেগুনবাড়ি রেল ব্রিজ সংলগ্ন 'বুরেরচর' গ্রামের যুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিই।

আজ সীমিত পরিসরে শুধু 'বুরেরচরের' যুদ্ধ সম্পর্কে বলতে চাই। কারণ, ওই যুদ্ধটি ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ, যা প্রায় ৩০ ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল এবং এ যুদ্ধে সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য আমাকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়। যদিও খেতাব পাওয়ার উপযুক্ত আরও বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধা ছিলো কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপর সেদিকে নজর দেওয়ার মতো মানসিকতা ও প্রস্তুতি তখনকার সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের ছিল না।

যুদ্ধে আমার সাহসিকতা এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপুল ক্ষয়ক্ষতির কথা আমি কখনো আমার কোনো ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাকে বিশদভাবে জানানোর ইচ্ছা পোষণ করিনি এবং তা করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগও পাইনি। কারণ, ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি ছয় মাসের জন্য বিদেশে উচ্চতর সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়ে চলে যাই। পরে জানতে পারি, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে আমার ব্যাটালিয়ন কমান্ডার আমার সহযোদ্ধাদের কাছ থেকে বুরেরচর যুদ্ধ সম্পর্কে শুনে আমাকে বীরত্বপূর্ণ খেতাবের জন্য সেনা সদরে সুপারিশ পাঠান। যা হোক, আমার অন্যান্য সহযোদ্ধারা ওই যুদ্ধে অপরিসীম সাহসিকতা প্রদর্শন সত্ত্বেও কোনো সাহসিকতার খেতাব না পাওয়ার দায়িত্বভার আমার ওপরে কিছুটা বর্তায়। সেই অপারগতার গ্লানিতে আমি ওই যুদ্ধে শহীদ ও জীবিত সব সহযোদ্ধাকে আমার বীরত্বসূচক খেতাবটি উৎসর্গ করলাম।

বুরেরচরের যুদ্ধ

বর্তমান শেরপুর জেলার নকলা উপজেলার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের পাশে বুরেরচর গ্রাম। ২৫ নভেম্বর বিকালের দিকে ৬০ জন বাছাই করা সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং মাসে ৪০০ পাউন্ড পিইকে এক্সপ্লোসিভ ও একটি বিশেষ অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় গোলাগুলি, তিনটি হালকা মেশিনগান, ১০টি সাবমেশিনগান, ১০/১২টি থ্রি নট রাইফেল নিয়ে সেখানে পৌঁছাই। এই গ্রামকেই 'বিশেষ অপারেশনের' জন্য চূড়ান্ত হাইডআউট হিসেবে নির্বাচন করি। বিশেষ অপারেশনটি ছিল বেগুনবাড়ি-বিদ্যাগঞ্জ ব্রিজটি এক্সপ্লোসিভ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে ময়মনসিংহ—জামালপুর রেল যোগাযোগটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কাছে অকেজো করে দেওয়া। বিলের মাঝামাঝি উত্তর-দক্ষিণ বরাবর একটি বাঁধ বুরেরচর গ্রামকে পূর্ব ও পশ্চিমে দুই ভাগে ভাগ করেছে। আমরা পশ্চিম দিকে অপেক্ষারত শুকনো জায়গায় অবস্থিত মোট চার-পাঁচটি বাড়িতে অবস্থান নিয়েছি। নকলা থানা অঞ্চল থেকে নেওয়া গাইড

আবুল পারি এবং তার সহযোগী আমাকে সতর্ক করে দিল যে বুরেরচর ও এর আশপাশের অঞ্চলের বেশকিছু তরুণ ফুলপুরে রাজাকার— আলবদর ক্যাম্পে যোগ দিয়েছে। তাৎক্ষণিক স্থানীয় 'সহযোগী মুক্তিযোদ্ধা' এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণেচ্ছু নির্ভরশীল কয়েকজনের কাছ থেকে জানতে পারলাম যে পাকিস্তানে বিশ্বাসী মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের কিছু তরুণ স্বেচ্ছায় যোগ দিলেও অধিকাংশ তরুণকে গ্রাম/ইউনিয়ন পিস (শান্তি) কমিটির নেতারা জোর করে অথবা মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে অথবা ঘর থেকে মা বোনকে উঠিয়ে নিয়ে পাকিস্তানি ক্যাম্পে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে রাজাকার ও আলবদর বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করে। এই সংবাদ এতই বাস্তব ছিল যে আমার হাবিলদার মেজর মো. ইদ্রিস আলী (ইদ্রিস আলী মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে ময়মনসিংহ ১৩ ইপিআরের একজন ল্যান্সনায়েক ছিলেন এবং তিনি সেখানে ১৩ ইপিআর রাইফেলের একটি কোম্পানির এলএমজি ম্যান ছিলেন। দুর্ধর্ষ এই বীর মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার এলএমজি ছয়টি গুলিভর্তি ম্যাগজিন এবং ম্যাগজিন রক্ষিত একটি স্টিলের বাক্স নিয়ে সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।) আমাকে জানান, যে বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা করল সেই বাড়ির মালিকের ছেলেই একজন রাজাকার! তার সঙ্গে আলাপচারিতায় সে স্বীকার করল যে তার ছেলে ফুলপুরে রাজাকার ক্যাম্পে আছে। আমাদের মনোবল তখন তুঙ্গে। দু-তিন দিনের ভেতর রেলওয়ে ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়ার সম্ভাব্য সাফল্যের কল্পনায় সবাই রোমাঞ্চিত। আমি আমার সব সহযোদ্ধাকে ডেকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম, সন্ধ্যা থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত যেন সবাই বিশেষ সতর্ক থাকে। আমাদের তার বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে প্রথম রাতের খাবার ওই রাজাকারের বাবাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়েই আয়োজন করলেন। তবুও পরবর্তী দুই-তিন দিন এক মুহূর্তের জন্যও ওই লোকের প্রতি আমার বিশেষ নজরদারি শিথিল করিনি।

২৬ ও ২৭ নভেম্বর আমি এক্সপ্লোসিভ ব্যবহারে বিশেষ প্রশিক্ষণ নেওয়া পাঁচ-ছয়জনের রেকি পার্টি সকাল-সন্ধ্যা পাঠিয়ে রেলওয়ে ব্রিজের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, নির্মাণ কাঠামো, ব্রিজটি পাহারায় কতজন শত্রুসেনা মোতায়েন আছে এবং তাদের কাছে কী কী ভারী অস্ত্র আছে ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। আমি মন স্থির করি যে ২৮ তারিখ সকাল ও সন্ধ্যায় আমি নিজে ব্রিজটি পর্যবেক্ষণ করে ২৯/৩০ নভেম্বর ভোরের মধ্যে ব্রিজটি ৪০০ পাউন্ড এক্সপ্লোসিভ চার্জ দিয়ে ধ্বংস করব।

ময়মনসিংহ থেকে রাতে দু-একটি ট্রেন জামালপুর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করত। বেগুনবাড়ি স্টেশনে ট্রেন এলে আমি সতর্ক হয়ে যেতাম। অবশ্য পাঁচ-ছয় মিনিট পর ট্রেন নিয়মমাফিক ছেড়ে দিলে আবার শঙ্কামুক্ত হতাম। ২৮ নভেম্বর মধ্যরাত পেরিয়ে ২৯ নভেম্বর ভোর তিন-চারটার দিকে আগের সময়সূচি ভঙ্গ করে একটি ট্রেন বেগুনবাড়ি আসে এবং আধা ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও স্টেশন ত্যাগ করার কোনো লক্ষণ না দেখে আমার অনুধাবন করতে এতটুকু অসুবিধা হলো না যে আসলে

ট্রেনটি পাকিস্তানি সেনা নিয়ে আসা একটি 'বিশেষ ট্রেন' এবং সম্ভবত তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো সূর্য উদয়ের প্রাক্কালে আমাদের অবস্থানে আক্রমণ করা।

পুনশ্চঃ অনেক বছর পার হয়েছে বুরেরচরের যুদ্ধ। তত দিনের অনেক স্মৃতি কালের গহ্বরে ঢুকে এখন বিস্মৃত হয়েছে। সহযোদ্ধাদের সবার নাম ও অনেক ঘটনা হারিয়ে গেছে স্মৃতি থেকে। এই লেখার কিছু দিনক্ষণ ভুল হতে পারে। এ অপারগতার সব দায় আমার একার। এখন প্রচণ্ড আক্ষেপ হয়, কেন সময়মতো স্মৃতিগুলো লিপিবদ্ধ করিনি। আমাকে কি বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ক্ষমা করবে?

আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি

আমি ত্বরিৎ গতিতে শোয়া অবস্থা থেকে উঠে গেলাম এবং হাবিলদার ইদ্রিস ও অন্যান্য অভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে দ্রুত মতামত বিনিময় করি। অন্যান্য বাড়িতে অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণ সতর্ক করে দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত স্ব স্ব ডিফেনসিভ অবস্থানে অস্ত্র নিয়ে শত্রু আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বললাম। যেহেতু আমরা একটি বিলের মধ্যে ছিলাম, সেহেতু আক্রমণ যেকোনো দিক থেকে আসার আশঙ্কা ছিল এবং আমরা সবাই চরম এক উত্তেজনা নিয়ে যেকোনো দিক থেকে শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। পূর্বদিগন্তে ভোরের আকাশ মাত্র ২৯ নভেম্বরের দিনটির যাত্রা শুরু করল, ঠিক তখনই আমাদের পূর্ব দিকে অবস্থিত বেড়িবাঁধের পূর্ব পাশে বুরেরচর গ্রামের অবশিষ্ট বাড়িগুলো থেকে 'টাক ডুম' শব্দ করে প্রথম গুলির আওয়াজ আমাকে নিশ্চিত করল যে প্রথম আক্রমণটা খুব সম্ভবত পূর্ব দিক থেকে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সব সহযোদ্ধাকে নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে দ্রুত নিচে নেমে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা লাইনে সঙিন উঁচু করে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বেড়িবাঁধের দিকে দৌড়ে গিয়ে সেটা দখল করে তার গোড়ায় অবস্থান নিতে চিৎকার করে নির্দেশ দিই এবং একই সঙ্গে সহযোদ্ধা নজরুল (ঢাকার মিরপুর), আবুল পারি (নকলা), শেরপুরের মনিরুল ইসলামকে (১৪/১৫ বছরের দুর্দান্ত সাহসী মুক্তিযোদ্ধা (ঢাকার শেরেবাংলা নগর) দ্রুতগতিতে গিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বাড়িগুলোতে অবস্থানরত সব সহযোদ্ধাকে আমার আদেশ পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতে পাঠিয়ে দিলাম। ওই সময় আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, যে পক্ষই ওই বেড়িবাঁধ আগে দখল করে তার আড়ালে অবস্থান নেবে সে পক্ষই ওই যুদ্ধে জয়ী হবে এবং তা করব বলেই দৃঢ়চিত্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। তিন-চার মিনিটের মধ্যে নভেম্বরের শীতের কুয়াশায় আবছা ঢাকা বেড়িবাঁধের ওপার থেকে শত্রুদের সমবেত কণ্ঠে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি শুনতে লাগলাম এবং আমাদের সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে কয়েকজন রাজাকার 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনি করতে করতে আমাদের অবস্থানের দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে বাঁধ আক্রমণ করে এগুতে লাগল। বোঝা গেল পাকিস্তানি সেনাদলের মূল অংশটি তখনো বাঁধের পূর্ব দিকের বাড়িগুলোতে অবস্থান নিয়ে আছে। আর

কালবিলম্ব না করে আমি সহযোদ্ধাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সঙিন উঁচু করে 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে বাঁধের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার ৭০ জনের অধিক সহযোদ্ধা আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে। 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে দুর্বার বেগে বাঁধের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে ধাবিত হতে লাগল। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, আমাদের এই অপ্রত্যাশিত হুংকার এবং প্রচণ্ড গতি দেখে বাঁধের এপাশে চলে আসা তিন-চারজন রাজাকার আলবদর আতঙ্কিত হয়ে উল্টো দিকে ফিরে দৌড়ে বাঁধ অতিক্রম করে অল্প কাদাযুক্ত নাড়ার ক্ষেতের উপর দিয়ে পূর্বদিকের বাড়িগুলোর দিকে পালাতে লাগল। এই সময় ওখান থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কমান্ডারদের পুনঃ পুনঃ চিৎকার শুনতে পেলাম, 'শালা লোক ওধার পজিশন লেও, পিছে মাত আও।' কিন্তু তাদের পিছে পিছে নেকড়ের গতিতে ধেয়ে আসা মুক্তিপাগল একদল দুর্দান্ত তরুণের ছোঁড়া গুলিতে নিশ্চিত মৃত্যুভয় তাদের পাকিস্তানি ওসব কমান্ডারের আদেশ মানতে কোনো রকম অনুপ্রাণিত করল না। এক মিনিটের মধ্যে এক প্রচণ্ড বেগে আমরা বেড়িবাঁধ দখল করে ফেললাম। আমাদের হেডকোয়ার্টারে ছিল হাবিলদার ইদ্রিস, মনিরুল ইসলাম এবং দুর্দান্ত সাহসী সহযোদ্ধা মজিবর (নকলা)। ইদ্রিস এলএমজি নিজে বহন করছে বিধায় সে এবং তার এলএমজিম্যান-২ আমাদের ১০ গজ পিছে ছিল। এর মধ্যে পাকিস্তানিদের দিক থেকে আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। যেই মুহূর্তে আমি এবং মুজিবর বাঁধের গোড়ায় সেই মুহূর্তে যুদ্ধ কৌশলের রীতি অনুযায়ী পৌঁছে গেলাম, আমি সতর্ক ছিলাম যেন আমার মাথা বা শরীরের কোনো অংশ শত্রুর দৃষ্টিতে না পড়ে। কিন্তু টগবগে তরুণ মুজিবরের সেই সম্মুখযুদ্ধ কৌশলের সার্বিক প্রশিক্ষণ জানা ছিল না বিধায় কিছু না বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম, সে সম্ভাব্য শত্রু নিধনের চরম উত্তেজনায় দুর্বার গতিতে এসে বেড়িবাঁধের ওপর উঠেই দৃঢ়ভাবে মুষ্ঠিবদ্ধ ডান হাতটি সজোরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মেরে প্রচণ্ড গলায় 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে লাফিয়ে উঠল। প্রায় একই সঙ্গে দেখলাম 'জয় বাংলা' ধ্বনিটি তার মুখ থেকে সম্পূর্ণ উচ্চারিত শেষ হওয়া অসম্পূর্ণ থাকতেই তরুণ মজিবর একই গতিতে যেন প্রচণ্ড একটি অশুভ ধাক্কায় ছিটকে বাঁধের গোড়ায় আমার শরীর ঘেঁষে পড়ে গেল। দেখতে পেলাম তার গলার ডান পাশ একটি ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ঘাতকের একটি নিষ্ঠুর গুলি তার ডান চোয়ালের নিচে আঘাত করল। ইদ্রিসের কাছ থেকে গামছা নিয়ে বৃহদাকার ক্ষতস্থানে চেপে ধরলাম। কিন্তু প্রচুর রক্তপাত কোনোক্রমেই বন্ধ করতে পারলাম না। মুজিবর আমার বাম হাতটা খুব জোরে চেপে ধরে মাত্র ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে নিজের শরীরের অজস্র রক্তে বাংলা মায়ের বদনখানি রঞ্জিত করে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। গ্রামের এই সরল যুবকের রক্তের ঋণ আমরা এখনো পরিশোধ করতে পারিনি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের বীরত্ব-সূচক কোনো সম্মান তো দূরের কথা, তার অমর কীর্তির কথাটি পর্যন্ত আমরা কোথাও লিপিবদ্ধ করতে পারিনি। আমি সে জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করি এখনো।

ইতোমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় শুরু হয়ে গেছে। আমাদের কৌশলগত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থানের কারণে, 'নাড়া ক্ষেতে' ইতস্তত পড়ে থাকা এবং বাঁধের পূর্ব দিকের দু'তিনটি বাড়িতে প্রচুরসংখ্যক পাকিস্তানি নিয়মিত সেনা রেঞ্জার এবং আলবদর ও রাজাকার সমন্বয়ে গঠিত শত্রু পক্ষ ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং তাদের পরিষ্কারভাবে দেখে-শুনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করতে পারছিলাম।

আমার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল রেলওয়ে ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়া, বুরেরচরের মতো একটি সম্মুখযুদ্ধে বেশিক্ষণ জড়িয়ে পড়ার মতো অতিরিক্ত গোলা-বারুদ আমার দলে ছিল না। তখন আমি 'ফায়ার শৃঙ্খলার' দিকে নজর দিলাম এবং সবাইকে নির্দেশ দিলাম যে, শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এবং তাকে নিশ্চিত ঘায়েল না করতে পারলে কোনো গুলি খরচ করা যাবে না। তিনটি এলএমজির একটি আমি নিজে চালাতে লাগলাম। সকাল নয়টা নাগাদ কুয়াশা কেটে অনেকাংশে দেখতে পেলাম বাঁধের দক্ষিণ প্রান্তে (আমাদের অবস্থান থেকে ৭০০-৮০০ গজ) শত শত গ্রামবাসী জট হয়ে কৌতূহলভরে আমাদের এবং শত্রুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ উপভোগ করছে। দুর্ভাগ্যবশত বুরেরচর গ্রামের পূর্বাংশের দক্ষিণ দিক থেকে ১৫০-২০০ গজ দূরে দক্ষিণে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা কৌতূহলী এক তরুণী কুলবধূ ও কোলে থাকা তার ছোট্ট একটি শিশু উভয়ই মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ হয়। অবশ্য পরে জেনেছি যে অলৌকিকভাবে দুজনই বেঁচে যায়। আমার সহযোদ্ধাদের দক্ষিণাংশের একটি ছোট দল, তাদের কমান্ডার আবদুল আলীম। যুদ্ধ-পূর্বকালীন সময়ে সে নকলা থানা এলাকায় ডাকাতি করত বলে জনশ্রুতি ছিল এবং সে এলাকায় ভূত নামেও নাকি পরিচিত। তার সম্পর্কে এবং যুদ্ধে তার দুঃসাহসিকতার কাহিনি লিখে বর্তমান পরিসরে শেষ করা যাবে না। সে আমার কাছে এসে বলল, 'স্যার, আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার অবস্থানের উল্টো দিকে শত্রুপক্ষকে আরও দক্ষিণ দিক থেকে গিয়ে ঘায়েল করতে কিংবা সারেন্ডার করতে চেষ্টা করাতে পারি।' যুক্তি হিসেবে সে বলল, ওই দলে কিছু রাজাকার এবং পুলিশ সদস্য তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। আমি তাকে সতর্ক করে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'আবদুল আলীম, এটা তো এমনও হতে পারে যে কৌশলে তোমাকে সেখানে নিয়ে তুমি এবং তোমার সহযোদ্ধাদের তারা বন্দি করে ফেলবে' উত্তরে আবদুল আলীম অত্যন্ত দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'স্যার, আপনার দোয়া থাকলে 'ফাইয়ারা' (অর্থাৎ পাকিস্তানিরা) আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমি নিশ্চিত যে শত্রুপক্ষের ওই লোকগুলো প্রকৃতই আত্মসমর্পণ করতে চায়।' যা হোক, যুদ্ধে অধিকতর পাওয়ার আশায় ঝুঁকিও কিছুটা নিতে হয়, তাই আমি রাজি হয়ে তাকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে বললাম এবং সর্বদক্ষিণে অবস্থিত এলএমজিম্যান মুক্তিযোদ্ধা ইউসুফ (যুদ্ধ-পূর্বকালে পুলিশে চাকরি করতেন) মুক্তিযোদ্ধা কাসেম (সম্ভবত টাঙ্গাইলের), মুক্তিযোদ্ধা নজরুল প্রমুখকে আবদুল আলীমের দুঃসাহসিক অভিযানে কাভারিং ফায়ার দিতে নির্দেশ

দিলাম। আনুমানিক আধা ঘণ্টা পর আবদুল আলীম ময়মনসিংহ কোতয়ালী থানার ওসি, সাব-ইন্সপেক্টর আবুল হোসেনসহ ১২ জন বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ সদস্য, একজন গুরুতর আহত কালো ড্রেস পরা আলবদর সদস্য এবং জনা তিনেক রাজাকার ধরে নিয়ে সগর্বে আমার সামনে উপস্থিত। আমি আবদুল আলীমের সাহসিকতায় বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তার আগের অবস্থানে যেতে বললাম এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে কোনো শত্রু আমাদের ঘিরে ফেলার চেষ্টা করে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিলাম। আবদুল আলীম সম্ভবত এখনো বেঁচে আছে কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে যুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে তাকে কোনো সম্মান বা পদক আমি এবং আমরা দিতে তো পারলাম না বরং তার নামে স্বাধীনতা-পূর্ব ডাকাতির কয়েকটি মামলা তার পিছু নিয়ে তাকে বেশ কিছুদিন লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গিয়েছিল।

বেলা বাড়তে লাগল। প্রায় সকাল সাড়ে ৯টা-১০টা, আমরা সবাই দেখে-শুনে একটি একটি করে শত্রু নিধনে ব্যস্ত এবং পাকিস্তানিদের ছোঁড়া ইতস্তত দুই ইঞ্চি মর্টার শেল যখন আমাদের সমূহ ক্ষতি করতে পারছিল না, তখন এই যুদ্ধরত দলের লিডার হিসেবে একটি সুগভীর দুশ্চিন্তা আমাকে তাড়া করছিল যে, সবাইকে তো খাবার দিতে হবে। তারা শেষ খাবার খেয়েছে গত রাতে। তখন সৈনিকের সেই বেদ বাক্য 'Soldier marches on belly' (সৈনিক পেট ভরা থাকলে হাঁটে) ভীষণ মনে পড়তে লাগল। রাত আটটার দিকে। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা খাবারের জন্য এতটুকুও বিরক্ত করছে না, তারা শুধু শত্রু নিধনে বিভোর। যা হোক, আমি ও ইদ্রিস যখন খাবার নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়তে লাগলাম, তখন দেখি দক্ষিণ গ্রাম থেকে বাঁধের আড়ালে আমাদের দিকে দু-তিন জন লোক আসছে। প্রথমে ভাবলাম, শত্রুর কোনো চাল নয় তো? আরও তিন-চার মিনিট গেলে বুঝতে পারলাম দুজন লোক লুঙ্গি মালকোচা করে একটি বেশ বড় টুকরি ধরাধরি করে কিছু একটা নিয়ে আসছে। একটু পর দেখলাম টুকরি থেকে ভাপ উঠছে। চোখ বুজে বিধাতাকে কৃতজ্ঞতা জানালাম তাঁর ওই মহানুভবতায়। টুকরিভর্তি গরম ভাঁপাপিঠা। শুনলাম যে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দূরের দক্ষিণের ঐ গ্রামের সব নারী একত্র হয়ে ভাঁপাপিঠা বানিয়ে তাদের স্বামীদের দিয়ে ওই অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ পথে আমাদের জন্য পাঠিয়েছে। বুরেরচরের যুদ্ধে ওই গ্রামের মানুষেরা বিশেষ করে নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে। পরম তৃপ্তিতে সবাই প্রায় দুটো করে ভাঁপাপিঠা খেয়ে আবার যুদ্ধে মনোনিবেশ করলাম।

তাহের আহমেদ, বীর প্রতীক

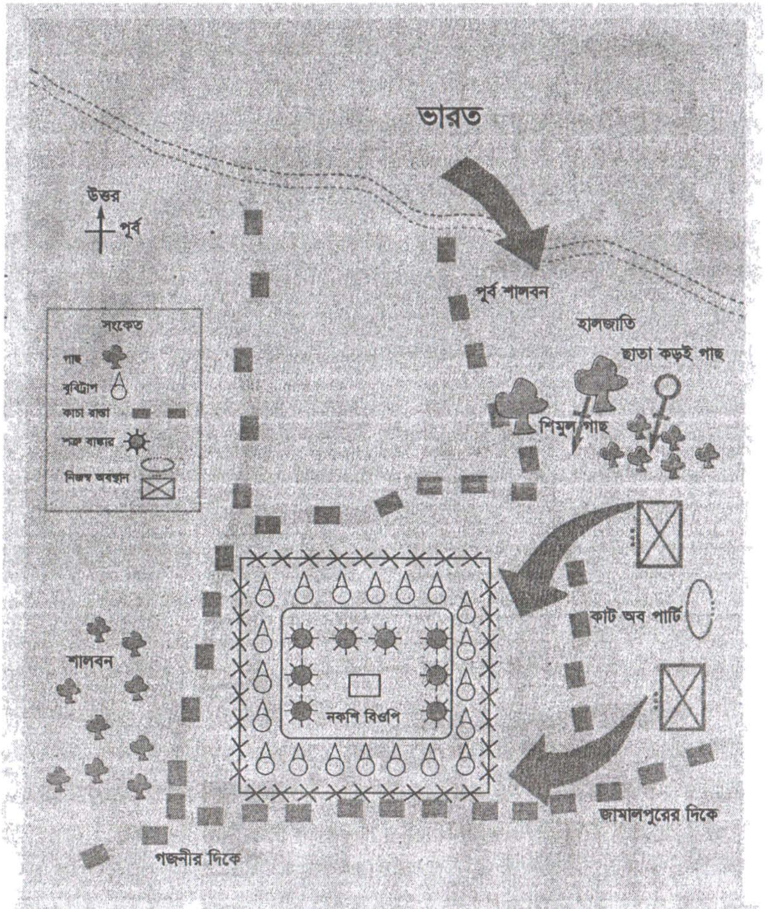
নকশি বিওপি আক্রমণ

মেজর জেনারেল আমীন আহম্মেদ চৌধুরী, বীর বিক্রম

বাংলাদেশ বাহিনীর প্রথম পদাতিক ব্রিগেড গঠনের পর ব্রিগেড কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমানের এক যৌথ নির্দেশ অনুযায়ী নকশি বিওপির ওপর আক্রমণের দায়িত্ব বর্তায় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর। নকশি বিওপি জামালপুর মহকুমার ঝিনাইগাতি থানার অন্তর্গত। এলাকাটি শালবন আচ্ছাদিত এবং সমতলভূমি থেকে কিছুটা উঁচু টিলাসংবলিত। আশপাশে টিলার মাঝখানে কিছুটা নিচু ভূমিতে ছিল নকশি বিওপির অবস্থান।

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত তিনটা ৪৫ মিনিটে আর্টিলারি ফায়ার শুরু করার সংকেত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠে। নিজেদের আর্টিলারির তিনটি গোলা ভুল করে আক্রমণের শুরুর স্থানে (এফডব্লিউপিতে) এসে পড়ায় আমাদের ছয়জন সেনা হতাহত হয়। ফলে ওই প্লাটুনে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং প্লাটুনের সদস্যরা আহত সেনাদের সেবার নামে এফইউপিতেই থেকে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠার মিনিট খানেকের ভেতর পাকিস্তানি আর্টিলারি গর্জে ওঠে। একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি, বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানির জন্য। কারণ, আমার দুই কোম্পানিতে (অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল) ৩০০ জনের মধ্যে শুধু ১০ জন সামরিক বাহিনীর লোক গোটা আটেক ইপিআর এবং দু-তিনজন পুলিশের লোক ছাড়া বাকি সবাই সাত দিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রাম বাংলার একান্ত সাধারণ মানুষ। এদিকে হালজাতি গ্রাম থেকে ইপিআরের দুটি প্লাটুন শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ শুরু করে এবং আক্রমণব্যূহ রচনা করে শত্রুসেনাদের ঘাবড়ে দেয়। এই সুযোগে আক্রমণকারী দল ৫০০ গজ দূরে নালার কাছে পৌঁছালে আমি মর্টার গ্রুপকে নালার পাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়ে ৩০০ গজ দূরবর্তী শত্রুশিবিরে গোলাবর্ষণ করার নির্দেশ দিই। এই নির্দেশের সুযোগে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় সব সেনাই নালার আড়ালে অবস্থান নিয়ে মাথা নিচু করে অনুমানের ভিত্তিতে ফায়ার করতে থাকে। নালায় আমার সেনাদের এমন কাণ্ড দেখে শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি। এমনকি কলার চেপে ধরে এবং জোর করে আগে পাঠাতে শুরু করি। আমার বাঁ দিকে হাবিলদার নাছির

তাঁর সেকশন নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ক্ষিপ্রগতিতে এগোতে থাকেন এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সঙ্গে করে ডানে বাংকারের দিকে এগোতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত। ইতোমধ্যে আমরা অ্যাসল্ট লাইন ফর্ম করে চার্জ বলে হুংকার দিতেই মুহূর্তে 'ইয়া আলী' বলে আমার সেনারা সঙ্গিন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমতো দৌড়াতে শুরু করে। তাদের উত্তেজনাকে বাড়ানোর জন্য নায়েব সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তাকবির' ধ্বনি করলে সেনারা ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করে পুরো যুদ্ধের ময়দানকে প্রকম্পিত করে তোলে। আমরা যখন শত্রুশিবিরের মাত্র ১০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যাই, ঠিক তখনই শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি আর্টিলারি শেল এসে আমাদের ওপর বিস্ফোরিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়ল, যার ভেতরে সম্ভবত হাবিলদার নাসিরও ছিল।



নকশি বিওপি যুদ্ধের নকশা

আমাদের সেনারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগল। আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সঙ্গে আরও ৫০ গজ এগিয়ে যাই এবং ছত্রভঙ্গ অবস্থায় আমাদের ছেলেরাও এগিয়ে গিয়ে পলায়নরত শত্রুসেনাদের আঘাত করতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষেও তখন হতাহতের ঘটনা ঘটছিল। কেউ মাইন বিস্ফোরণে, কেউ বা গুলিতে হতাহত হচ্ছিল। আমি আরও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করি এবং হঠাৎ বাঁ পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যাই। একই সময়ে বাঁ দিক থেকে এক পাকিস্তানি সেনা সঙ্গিন উঁচু করে আমার দিকে বন্দুক তাক করে আসতে থাকে। এমন সময় অল্প বয়স্ক ছেলে সালাম (অষ্টম শ্রেণির ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) সেই পাকিস্তানি সেনাকে গুলি করে হত্যা করে। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দুটি ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডান দিকের বাংকারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারি ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম। ওই একটি বাংকারে অবস্থিত শত্রুর নিখুঁত গুলিবর্ষণ আমাদের ভীষণভাবে ঘায়েল করছিল, অন্য বাংকারগুলো থেকে গুলির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্ভবত কাউন্টার অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছিল অথবা পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হানিফ বারবার অনুরোধ করছিল, 'স্যার, আব পিছে চলে যাইয়ে, ম্যায় কভারিং দে রাহাহু।' হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেওয়ার আগেই হিসিং শব্দ হলো। আমি হানিফকে মৃদু আঘাত করে ডাকলাম 'হানিফ'- কোনো উত্তর এল না। সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুর গুলিতে আমার পাশের মাটি উড়ে গেল, শত্রু আমায় দেখে ফেলেছে বুঝতে পেরে সাইডরোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করি। এমন সময় বাঁ দিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডান হাতের কনুইয়ে লাগে, ফলে হাতের স্টেন ছিটকে পড়ে, বাঁ হাতে তা কুড়িয়ে নিলাম। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড ড্রেসিংটা বের করব, এক ঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর এত কাছে থাকা সম্ভব না। আমাদের যে আট-দশজন লোক শত্রু বাংকারে ঢুকে পড়েছিল এয়ার ব্রাস্ট আর্টিলারি ফায়ারে তারা ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সিরাজ এবং পুলিশের ল্যান্সনায়েক সুজা মিয়াও ছিল। ফিল্ড ড্রেসিং বের না করে সাইড রোল শুরু করার কিছুক্ষণ পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডানে না গিয়ে আমি কোনাকোনি শত্রুশিবিরের দিকেই যাচ্ছি। মাথাটা ঠাণ্ডা রেখে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। উদ্দেশ্য হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌঁছাতে হবে। ক্রল শুরু করব, এমন সময় দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম হঠাৎ করে দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটি এলএমজি নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে হুংকার দিয়ে শত্রুবেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। চিৎকার করে বলছিল, 'তোরা আমার মা-বাপ, ভাই-বোন সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দেব?' কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল, সেই সালামকে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি। অথচ বাচ্চা বলে এবং তার সংসারে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি বলে

আমি তাকে যুদ্ধে শামিল করিনি, কিন্তু সে পালিয়ে এসে অ্যাসেম্বলি এরিয়ায় আমাদের সঙ্গে চুপি চুপি যোগ দেয়।

শালবনে অবস্থানরত আমাদের মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠছে সম্ভবত আমার পশ্চাদ অনুসরণ সেনাদের কাভারিং ফায়ার দিচ্ছিল। তাই আমি নিজেদের ফায়ার থেকে বাঁচার জন্য ডানে অপেক্ষাকৃত নিচু ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগোতে শুরু করি। নালার কাছে পৌঁছে সব শক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম। শরীরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। তাই বুঝি সমস্ত জোর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। দু-এক কদম যাওয়ার আগেই একঝাঁক গুলি আমার পায়ের কাছের মাটি উড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপর পড়ে গেলাম। শত্রুর আর গুলি আসছে না দেখে স্বস্তি বোধ করলাম। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার আগেই টের পেলাম ১০-১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। বোধ হয় ঠেলে ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালানোর পথ। সঙ্গে হাতের ও পায়ের রক্ত বেশি করে চিহ্নিত করছিল সেই পথকে। পাশের ধানক্ষেত থেকে একজন আহত সৈনিক বলছিল, 'আই বাঁচতে চাই, আঁরে লই যা'- অগ্রসরমান শত্রু তাকে খতম করে দিল। প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এর পরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। হাতে বাঁধা কর্দমাক্ত ঘড়ির দিকে তাকালাম সকাল আটটা ১০ মিনিট। শত্রু তখন ৫০ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। শেষবারের মতো টেনেহিঁচড়ে নিজের বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারি শেলে সৃষ্ট একটি গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায় সে জন্য গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে লেপে দিলাম। স্টিল হেলমেট মাথার নিচে দিয়ে চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় রইলাম। ঠিক এমন সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমীনের কণ্ঠস্বর ভেসে এল শালবন থেকে- 'আমীন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করো' আহত হওয়ার তিন ঘণ্টা পর এই প্রথমবারের মতো সক্রিয় সাহায্য পেলাম। স্টেনগানটিকে আমার পায়ের সঙ্গে বেঁধে স্ট্রেচারের মতো করে একটু ওপরের দিকে তুলে ধীরে ধীরে টানতে শুরু করলেন। ডান পায়ের ব্যথায় ডুকরে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। লেফটেন্যান্ট মোদাস্‌সের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে, 'তাড়াতাড়ি করেন স্যার'। শত্রুরা তখন আমাদের ২০-২৫ গজ পেছনে একজন আহত জওয়ানকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে। আমাদের দুই এলএমজিওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে, 'আপনাদের ধরে ফেলবে স্যার'। দাঁত খিঁচিয়ে মেজর আমিন বললেন, 'বেটা ফায়ার কর'। আমাদের ওপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই আমাদের জওয়ানরা ইতস্তত করছিল। শত্রু তখন আমাদের ওপর চার্জ শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে এলএমজি গর্জে উঠল। ছয়-সাতটি খানসেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। মকবুল আর তার সাথি দালালকে আমরা হাতেনাতে ধরে

ফেললাম। দুটি খানসেনা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে লাগল। আর্টিলারি ফায়ারের মধ্যে মেজর আমীন আমায় কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরিশ্রান্ত থাকায় তিনি নিজেই আমায় নিয়ে নালায় পড়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত আমি জোর করে তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম এবং সে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'স্যার চিন্তা করবেন না, মরলে দুইজন একসঙ্গে মরব' বলেই দিল ভোঁ এক দৌড়। দৌড়ে রেজিমেন্টাল এইড পোস্টে পৌঁছে যায়। আরওপি থেকে জিওসি গুর বক্স সিংহ গীল তাঁর হেলিকপ্টারে করে আমাকে গৌহাটি সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যান।

যুদ্ধে আমাদের পক্ষে ৩৫ জন হতাহত হয়, যার ভেতর যুদ্ধের ময়দানে ১২ জনের লাশ থেকে যায়, বাকি আহত সেনাদের গৌহাটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মেজর জেনারেল আমীন আহম্মদ চৌধুরী, বীর বিক্রম

কোম্পানি কমান্ডার (আগস্ট পর্যন্ত); সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সামরিক বিশেষজ্ঞ

জন্ম : ১ জানুয়ারি, ১৯৪৬, ফেনী। ৫ জুন, ১৯৬৬ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ কমিশন লাভ করেন। সত্তরের মার্চে তিনি ক্যাপ্টেন পদবীতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্তব্যরত ছিলেন। ২৪ মার্চ, ১৯৭১, ১৪ ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা চট্টগ্রাম থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারসহ (বাঙালি) ক্যাপ্টেন আমীনকে আগাম কোনো সংবাদ ছাড়া হেলিকপ্টারে ঢাকা নিয়ে আসেন। ক্যাপ্টেন আমীন পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

তিনি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ করেন। ৩ আগস্ট তিনি শেরপুরের নক্‌শী বিওপিতে শত্রু অবস্থানের উপর দুই কোম্পানি গণযোদ্ধা নিয়ে আক্রমণকালে মারাত্মকভাবে আহত হন। সাহসিকতার জন্য তাকে 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ : ২৬ মার্চ, ২০১৩, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

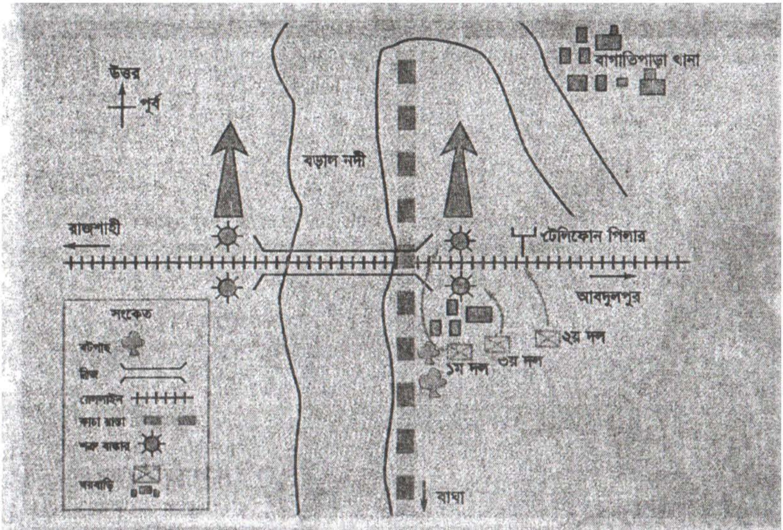
অপারেশন আড়ানি

আজাদ আলী, বীর প্রতীক

আড়ানি ব্রিজ রাজশাহী জেলায়। আড়ানি দিয়ে সুনসান বয়ে গেছে বড়াল নদ। খুব বেশি চওড়া নয় নদটি। আড়ানিতে বড়ালের উপর ছিল একটি রেলব্রিজ। রাজশাহীর সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের জন্য রাজশাহী আবদুলপুর রেললাইন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রেলপথটিকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে দরকার ছিল রেলব্রিজটি ধ্বংস করা। তাই আমরা ডিনামাইট দিয়ে আড়ানি ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা করি। কিন্তু আড়ানি বাজারে শক্ত অবস্থান ছিল রাজাকার এবং মিলিশিয়াদের। পাকিস্তানি সেনাদের দুটি বাংকার ছিল আড়ানি ব্রিজের পশ্চিম পাশে রেললাইনের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে। আর দুটি বাংকার ছিল নদের পূর্ব পাশে রেললাইন ঘেঁষে। সেতুটি ধ্বংস করতে হলে প্রথম দরকার ছিল রাজাকার মিলিশিয়া ও পাকিস্তানি সেনাদের এ অঞ্চল থেকে হটিয়ে দেওয়া।

এ অপারেশন পরিচালনার ভার বর্তায় আমার ওপর। অপারেশন আড়ানি ব্রিজে ২১ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল অংশ নেয়। এছাড়া দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য মেজর রশিদ তাঁর অধীনে থাকা ১১ জন সেনা ও দুজন নৌ কমান্ডারকে যুক্ত করেন আমাদের দলে। শেষ পর্যন্ত সব মিলিয়ে আমাদের সেনাসংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫-এ। আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি এলএমজি, তিনটি এসএমসি, ছয়টি ৭.৬২ এমএম এসএলআর এবং ২২টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল, ম্যাগনেটসহ আটটি ডিনামাইট, প্রয়োজনীয় কার্ডেক্স এবং দুটি টাইম পেনসিল/সুইচ।

আড়ানি রেলওয়ে ব্রিজের দক্ষিণে আড়ানি বাজার, উত্তরে জোতরঘু এবং পশ্চিমে বাসুদেবপুর এবং পূর্বে আড়ানি রেলওয়ে স্টেশন। ব্রিজের দুই পাশে আনুমানিক ২০-২৫ জন শত্রুসেনা বাংকার এবং ট্রেঞ্চে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে চার-পাঁচজন মিলিশিয়া ছাড়া বাকি সবাই বিহারি অথবা বাঙালি রাজাকার। মিলিশিয়া ও রাজাকারদের কাছে শুধু রাইফেল এসএমজি ছিল, কোনো এলএমজি ছিল না।



আড়ানি রেলসেতু অঞ্চলের যুদ্ধের নকশা

২২ অক্টোবর, ১৯৭১, ভারতের কাজীপাড়া ক্যাম্প থেকে আমি ও আমার দল আমাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং সরঞ্জামসহ হেঁটে পদ্মা নদী পার হয়ে শেষ রাতে তেঁতুলিয়া গ্রামে আসি। তারপর আমাদের দলটি তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে একই গ্রামের হযরত আলী, মোগল সরকার ও চিকিৎসক আখতারের বাড়িতে আশ্রয় নিই। দুপুর পর্যন্ত আমরা সবাই তেঁতুলিয়া গ্রামেই বিশ্রাম করি। জুমার নামাজের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনটি সেকশনে ভাগ হয়ে আড়ানি সড়ক ধরে এগিয়ে যাই। বেলা আনুমানিক দেড়টার দিকে আমরা আড়ানি বাজারে পৌঁছে যাই। দুপুর ১ ৪৫ মিনিটের দিকে ১ নম্বর সেকশনটি নদীর পাড় বরাবর, ২ নম্বর সেকশনটি আড়ানি গ্রামের পূর্বদিক বরাবর এবং ৩ নম্বর সেকশন দুটি দলের মাঝ দিয়ে পাকিস্তানি বাংকারে আক্রমণ চালায়। শত্রুপক্ষও বাংকার থেকে গুলি ছুঁড়ে পাল্টা জবাব দেয়। কিন্তু আমাদের তীব্র আক্রমণের মুখে শত্রুসেনারা টিকতে পারেনি। রেললাইনের উত্তর দিক অর্থাৎ গ্রামের মধ্য দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। সর্বডানে আমাদের যে দলটি (২ নম্বর) অগ্রসর হয়েছিল, তারা পরিকল্পনামাফিক ঠিক সময়ে ব্লক দিতে পারেনি। কিন্তু নির্দেশ অনুযায়ী, তারা টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের আক্রমণে একজন মিলিশিয়া এবং দুজন রাজাকার নিহত হয়। অস্ত্রসহ ধরা পড়ে দুজন বিহারি। পাকিস্তানি সেনারা অবস্থা বেগতিক দেখে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। শত্রুসেনার চারটি রাইফেল এবং কিছু গোলাবারুদ আমাদের হাতে আসে। এই যুদ্ধে আমাদের তেমন কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

আমাদের প্রাথমিক অভিযান খুব সহজে সফল হওয়ায় দলের সবাইকে ব্রিজ পাহারার নির্দেশ দিই। ইতোমধ্যে দুজন নৌ-কমান্ডো পরিকল্পনা অনুযায়ী পূর্ব দিক থেকে ব্রিজে প্রবেশ করে এবং ব্রিজের মাঝখানের নিচের দুটি স্প্যানে আটটি ডিনামাইট লাগায় এবং সাইক্লিক অর্ডারে দুটি সার্কিটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে টাইম পেনসিল দুটির পিন অপসারণ করে ফেরত আসে। সবাই স্পট থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে সরে এসে পুনরায় পজিশন নেয়। প্রায় ৩০ মিনিটের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ব্রিজের দুটি স্প্যান ভেঙে নদীতে পড়ে যায় এবং ব্রিজ ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। অপারেশন সফল হওয়ার পর আমাদের দলটি ভারতের দিকে চলে যেতে থাকে। আড়ানি ত্যাগ করার পথে আড়ানি বাজারে পাকিস্তানি সেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর শেলিং করে। তবে শত্রুদের শেলিং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি।

আড়ানি ব্রিজ ধ্বংস ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন। এ ব্রিজ ধ্বংসের ফলে রাজশাহীর সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। শত্রুসেনাদের মনোবলও ভেঙে যায়। সাফল্যে উজ্জীবিত হয় মুক্তিযোদ্ধারা।

আজাদ আলী, বীর প্রতীক

একাত্তরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বর্ষ সম্মানের ছাত্র। যুদ্ধ করেন ৭ নম্বর সেক্টরে। যুদ্ধে ডান হাত হারান বিস্ফোরণে। অসম সাহসের জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' বীরত্ব উপাধিতে ভূষিত করেন।

অপারেশন জ্যাকপট- দাউদকান্দি

শাহজাহান সিদ্দিকী, বীর বিক্রম

বাঙালি মাত্রই গান ভালোবাসেন। এর বাণী হৃদয়কে করে পুলকিত ও বিকশিত। আবার এ গানই যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিতে পারে বা রণাঙ্গনে হামলার সিগন্যাল হতে পারে, সে কথা কি কেউ ভেবেছে কোনো দিন? বিস্ময়কর ব্যাপার হলেও সত্যি যে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দুটি গান শত্রু পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা পরিচালনার সংকেত বা সিগন্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। আর এই অভিনব পদ্ধতিতে সিগন্যাল পেয়েই ১৯৭১ সালের মধ্য আগস্ট সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় সব কটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও নদীবন্দরে একই সময়ে একযোগে পরিচালনা করা হয়েছিল সফল নৌ-কমান্ডো অভিযান। সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে শুনেছিল আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা। অপারেশন জ্যাকপটের কথা।

১৯৭১ সালে নৌ-কমান্ডো হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। নয় সদস্যবিশিষ্ট আত্মঘাতী দলের দলনেতা হিসেবে অপারেশন জ্যাকপটের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ফেরিঘাটে প্রথম নৌ-প্রশিক্ষণ পরিচালনা করি।

প্রশিক্ষণ শেষে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন সামুদ্রিক ও নৌবন্দরে অপারেশন পরিচালনার জন্য কয়েকটি দল গঠন করা হয়। দুটি দলকে সড়কপথে পাঠানো হয় খুলনায়। চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জ নদীবন্দরে আক্রমণ পরিচালনার জন্য তিনটি দলকে সেনাবাহিনীর লরিতে করে ব্যারাকপুর সেনানিবাস হয়ে কলকাতার দমদম বিমানবন্দরে নেওয়া হয়। একটি দলে ছিলাম আমি। ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ডাকোটা বিমানে করে আমাদের পৌঁছে দেওয়া হয় আগরতলায়। এটা ছিল আমার জীবনে প্রথম বিমানভ্রমণ। আমাদের একটি ক্যাম্পে নেওয়া হয়। নাম ছিল 'নিউ ক্যাম্প'।

৫ বা ৬ আগস্ট সাবমেরিনার আবদুল ওয়াহেদ (এ ডব্লিউ) চৌধুরীর (বীর বিক্রম) নেতৃত্বে ৬০ জন কমান্ডো সড়কপথে হরিণা ক্যাম্প হয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের টার্গেট ছিল চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর। আমরা বাকিরা নারায়ণগঞ্জে

রওনা দেওয়ার অপেক্ষায় থাকি।

৭ বা ৮ আগস্ট। ভারতীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট দাস আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি তো সাবমেরিনার আবিদুর রহমানের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ অপারেশনে যাচ্ছ?' আমি হ্যাঁ-সূচক জবাব দিতেই তিনি বললেন, 'না, তোমাকে নারায়ণগঞ্জ যেতে হবে না। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি ফেরিঘাটে অপারেশন পরিচালনার জন্য নয় সদস্যবিশিষ্ট স্বতন্ত্র একটি কমান্ডো দল হবে। তোমাকে এ দলের লিডার বা দলনেতা মনোনীত করা হয়েছে।'

লেফটেন্যান্ট দাসের কথা শুনে আমি বিস্মিত এবং একই সঙ্গে আনন্দিত ও রোমাঞ্চিত হই। কারণ সব লক্ষ্যস্থলে অপারেশনের জন্য নৌ-কমান্ডোদের দলনেতা হিসেবে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাবমেরিনারদেরই নিয়োগ করা হয়েছে। আমাকে দলনেতা করা ব্যতিক্রম। অন্যদিকে রোমাঞ্চিত ও আনন্দিত এই ভেবে যে একটি স্বতন্ত্র নৌ-কমান্ডো দলের নেতৃত্ব পাওয়া আমার জন্য খুবই গর্বের এবং সম্মানের বিষয়। লেফটেন্যান্ট দাস আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সামরিক দিক বিবেচনায় দাউদকান্দি ফেরিঘাট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফেরিঘাটটি মেঘনা নদীর কারণে বিচ্ছিন্ন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সংযোগস্থলে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আনীত শত্রুপক্ষের সামরিক সরঞ্জামাদি, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ইত্যাদি পারাপার করা হয়ে থাকে এই ফেরিঘাটের মাধ্যমে। এজন্য দাউদকান্দি ফেরিঘাটটি ধ্বংস করে দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। ঘাটের পন্টুনসহ আশপাশে যে কটি ফেরি রয়েছে সেগুলো ধ্বংস করে দিতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী যে তোমরা এ অভিযানে সফলকাম হবে। তোমার সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে কমান্ডো মতিউর রহমান (বীর উত্তম)।

আলোচনার এক ফাঁকে বললেন, গান শুনবে— বাংলা গান? আমি মাথা নেড়ে সায় দিতেই উনি উঠে গিয়ে একটি টেপরেকর্ডার এনে পরপর দুটো পুরনো দিনের বাংলা গান আমাকে বাজিয়ে শোনালেন।

গানগুলোর অন্তরা বা প্রথম কলি ছিল— 'আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান/তার বদলে আমি চাই নে কোনো দান' এবং 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি/ওরে, তোরা সব উলুধ্বনি কর।'

শেষে লেফটেন্যান্ট দাস বললেন, 'আসল কথা। এ গান শুধু গানই নয়, এ গানের আরও অর্থ আছে।' আমি অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি বললেন, 'তোমরা যখন টার্গেটের কাছাকাছি পৌঁছে কোনো গোপন হাইডআউটে থাকবে তখন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে এ গান দুটো শুনতে পাবে। আর গানের মাধ্যমেই সিগন্যাল পাবে কোন দিন এবং কখন নির্ধারিত টার্গেটে হিট করতে হবে। প্রথম গানটি শোনার পর মহিলা শিল্পীর কণ্ঠে

গাওয়া দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। দ্বিতীয় গানটি যখন শুনবে তখন বুঝবে, ২৪ ঘণ্টা পর টার্গেটে আঘাত করতে হবে। এর ভিত্তিতে তোমাদের জিরো আওয়ার ঠিক করে নিতে হবে। সাবধান আর কেউ যেন, এমনকি তোমার সহযোদ্ধাদের মধ্যেও কেউ যেন বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে অপারশেনের সিগন্যাল প্রেরণের বিষয়টি জানতে বা বুঝতে না পারে। দলনেতা হিসেবে তোমাকে একটি ছোট ট্রানজিস্টার দেওয়া হবে।'

আবহাওয়ার রিপোর্ট, চন্দ্র-তিথি, জোয়ার-ভাটা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে অপারেশনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল। আগস্ট মাসের ২১ তারিখ সন্ধ্যার পর আমি আমার কমান্ডো দলকে নিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বকসনগর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করি। চাঁদপুরের দলও আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ওই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সাবমেরিনের আমিন উল্লাহ শেখ (বীর বিক্রম)। আমাদের পথ দেখিয়ে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাওয়া এবং গোপন হাইডআউটে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য সঙ্গে দুজন করে গাইড দেওয়া হয়। প্রত্যেক দলের জন্যই গাইডের ব্যবস্থা ছিল। আমাদের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল একটি করে অটোমেটিক স্টেনগান। প্রয়োজনীয় গুলিসহ একটি ম্যাগাজিন। প্রত্যেকের জন্য এক জোড়া সাঁতার কাটার ফিনস, একটি লিমপেট মাইন এবং একটি দুদিকে ধারালো কমান্ডো নাইফ। অতিরিক্ত হিসেবে আমার কাছে ছিল একটি ট্রানজিস্টার।

বকসনগর থেকে রওনা হয়ে আমরা কখনো ধানক্ষেতের আইল ধরে, কখনো বা পায়ে চলা পথ ধরে হেঁটে সামনের দিকে এগোতে থাকি। কিছুদূর যাওয়ার পর চাঁদপুরের দল ভিন্ন পথ ধরে গন্তব্যের দিকে যায়। আর আমরা কুমিল্লার কংশনগর বাজার হয়ে বন্ধরামপুর পৌঁছি।

১৩ আগস্ট, ১৯৭১ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে কাঙ্ক্ষিত সেই গানটি প্রচারিত হয়। আমার অন্য সঙ্গী কমান্ডোরাও আমার সঙ্গে ট্রানজিস্টারে গান শুনছিল। এ গানের মর্মার্থ তারা না বুঝলেও আমি বুঝে গেলাম। ৪৮ ঘণ্টা পর আমাদের অপারেশনে যেতে হবে। গানটি শুনে আমি কিছুটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি। তবে দ্রুতই আমার আবেগ সংবরণ করি। অপারেশনের প্রাথমিক সিগন্যাল পেয়ে গেছি, এটা কাউকেই বুঝতে দিইনি। রাতের বেলা আমি দলনেতা মতিউর রহমানকে (বীর উত্তম) পরামর্শের ছলে বললাম, সফলভাবে অপারেশন পরিচালনা করতে হলে টার্গেট এলাকা আগেভাগে রেকি করে নিলে ভালো হয়। আমার কথায় মতি রাজি হয়ে গেল। আমি ও মতি লুঙ্গি ও হাফ শার্ট পরে ভাড়া করা একটি ছইওয়ালা নৌকায় ১৪ আগস্ট সকাল আনুমানিক নয়টার দিকে দাউদকান্দির উদ্দেশে রওনা হই। আমাদের সঙ্গে চটের ব্যাগে ফোল্ডিং করে লুকিয়ে রাখা স্টেনগানটি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। দাউদকান্দি ফেরিঘাটের উত্তর-পশ্চিমে মেঘনা নদী, আর দক্ষিণে গোমতী নদী। তখন

ফেরিঘাটের উত্তর-পশ্চিম দিকে মেঘনা নদীর মাঝখানে একটি ছোট্ট চর ছিল। চর থেকে ফেরিঘাটের সবকিছু দেখা যেত। চরের পাশে কিছুক্ষণের জন্য নৌকা রেখে আমরা লক্ষ করলাম যে, ফেরিঘাটের পন্টুন থেকে একটু দূরে পশ্চিম দিকে নদীতে দুটি ভাসমান ফেরি নোঙর করা অবস্থায় আছে। এ দুটি ফেরি আর পল্টুনই হলো আমাদের টার্গেট। অপারেশন এলাকা ও টার্গেট ঠিক করার সময় আমাদের নৌকাটি চলছিল। একপর্যায়ে নৌকার গতি কমিয়ে আমি একটি গামছা পরে নদীতে নেমে পড়ি। ভাবটা এমন যে, নদীর পানিতে গোসল করতে নেমেছি। নামার উদ্দেশ্য নদীর পানির স্রোতের বেগ ও গতিধারা সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ। তখন বর্ষাকাল ছিল।

ফেরিঘাটটি মেঘনা ও গোমতী নদীর সঙ্গমস্থলে। আরও লক্ষ করলাম বর্ষাকালে ভরা নদীতে স্রোত তেমন নেই। উজানে এবং ভাটিতে সহজেই সাঁতার কেটে যাওয়া যায়। তবে নদীর তীরবর্তী ফসলের জমিতেও অথই পানি থাকায় কোথাও দাঁড়ানোর জায়গা নেই।

বন্ধরামপুরে ফিরে আসার পর থেকে শুরু হলো আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয় গানটি শোনার জন্য অপেক্ষার পালা। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যার পর আকাশবাণীর নিয়মিত অনুষ্ঠানে হঠাৎ 'আমার পুতুল আজকে যাবে শ্বশুরবাড়ি, ও রে ! তোরা সব উলুধ্বনি কর' গানটি শুনতে পেলাম। তার অর্থ তখন থেকে ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর টার্গেটে আঘাত হানতে হবে। আমি মনে মনে হিসাব করে দেখলাম, ১৫ আগস্ট দিবাগত রাতে অর্থাৎ ১৫-১৬ আগস্ট মধ্যবর্তী রাত আমাদের জন্য জিরো আওয়ার। ওই সময় থেকে এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করতে হবে।

সেই রাতে সঙ্গী কমান্ডোদের কাউকে কিছু না বলে চুপচাপ থাকলাম। ১৫ আগস্ট সকালে সবাইকে ডেকে বললাম, আজ রাতেই আমাদের অপারেশনে যেতে হবে। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া করে, গায়ে সরিষার তেল মেখে, সুইমিং কস্টিউমসহ যার যার লিমপেট মাইন ও ফিনস নিয়ে একটি খোলা নৌকাযোগে অপারেশনে বের হয়ে পড়লাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে পড়ে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলি। তার ওপর গাইড ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজে শীতে কাঁপতে থাকে। অসুস্থ বোধ করায় সে আমাদের সঙ্গে যেতে অপারগতা প্রকাশ করে। আমরা তাকে কোনোমতেই যেতে রাজি করাতে পারছিলাম না। এদিকে রাতও প্রায় শেষ হয়ে পূর্ব আকাশে ভোরের আলোর আভা ফুটে উঠতে থাকে। এ সময় অপারেশনে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। এঅবস্থায় আমাদের অনন্যোপায় হয়ে ওই দিনকার মতো অপারেশন স্থগিত করে অস্থায়ী ঘাঁটিতে ফিরে আসতে হয়।

যা-ই হোক সংকল্পে অটুট থেকে আমরা পুনরায় প্রস্তুতি নিয়ে ১৬ আগস্ট দিবাগত রাত আনুমানিক একটার সময় দাউদকান্দি ফেরিঘাটের একটি পন্টুন ও

দুটি ফেরিতে নৌ-কমান্ডো হামলা পরিচালনা করি। ওই তিনটি টার্গেটে মাইন ফিট করে আমরা পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত নৌকায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক প্রকম্পিত করে একে একে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হতে থাকে। আর নৌকায় নিরাপদ দূরত্বে থেকে আমাদের চোখমুখ বিজয়ের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এরপর আর কালবিলম্ব না করে আমরা আমাদের গোপন আস্তানা বন্ধরামপুরের উদ্দেশে নৌকাযোগে দ্রুত রওনা হই। আমাদের হামলায় দাউদকান্দি ফেরিঘাটের একমাত্র পন্টুনটিসহ অদূরে নোঙর করা দুটি ফেরি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পানিতে ডুবে যায়। আমাদের মতো অন্যান্য দলও ১৫ আগস্ট, ১৯৭১ সালের মধ্যরাতের পর একই সঙ্গে এই সময়ে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর, মংলা সামুদ্রিক বন্দর, খুলনা, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে সিরিজ নৌ-কমান্ডো হামলা পরিচালনা করে। তারা ডুবিয়ে দেয় সমুদ্রগামী জাহাজ ও বার্জ। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় বহুসংখ্যক নৌযান ও পন্টুন। সব নৌপথে সৃষ্টি হয় মারাত্মক প্রতিবন্ধকতা। আলোড়ন পড়ে যায় সারা বিশ্বে। এভাবেই সমাপ্ত হয় একটি বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানের মাধ্যমে পাওয়া সিগন্যাল অনুযায়ী পরিচালিত আমাদের দুর্ধর্ষ নৌ-কমান্ডো অভিযান।

এরপর বিদেশি জাহাজ চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরে আসতে অস্বীকৃতি জানায়। সামরিক ভাষায় এই নৌ-কমান্ডো হামলা 'অপারেশন জ্যাকপট' নামে খ্যাত। নৌ-কমান্ডোদের দুর্ধর্ষ ও সফল হামলার পর দিন যুদ্ধবাজ পাকিস্তানি সামরিক শাসক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণ দেয় এবং বলে, ভারতীয় নৌবাহিনীর ডুবুরিরা এসব আক্রমণ চালিয়েছে। কিন্তু তারা ভাবতেই পারেনি বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরাই চালিয়েছে এসব আত্মঘাতী কমান্ডো হামলা। চূর্ণ করে দিয়েছে তাদের সব অহংকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন সমুদ্র ও নদীবন্দরে একই সময় পরিচালিত এই সফল নৌ-কমান্ডো হামলা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ এবং বিজয় ত্বরান্বিত করে।

শাহজাহান সিদ্দিকী

অপারেশন জ্যাকপটের অন্যতম দলনেতা, সাবেক সচিব

সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো

তারিখ : ২৬ মার্চ ২০১৩, স্বাধীনতা দিবস সংখ্যা

পাক-বে ডকইয়ার্ড অপারেশন

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন, বীর প্রতীক

শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড় বন্দর থানা এলাকার নবীগঞ্জ কাইত্যাখালিতে অবস্থিত পাক বে ডকইয়ার্ড (Pak Bay Dockyard)। এখানে বড় বড় জাহাজ তৈরি করা হতো। এরই অন্য একটি প্রকল্প ছিল যেখানে স্পিডবোট তৈরি করা হতো। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই পাক বে ডকইয়ার্ডে একটি বড় জাহাজে পাক বাহিনীর একটি ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি হতে স্টিল বডির ছোট লঞ্চে করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নদী পথে দিনে ও রাত্রে টহল দিত। (পাক বে ডকইয়ার্ডটি একজন পাকিস্তানি মালিকের ছিল)।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে আমাদের ২ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ আমাদের ক্যাপ্টেন হায়দার সাহেবের উপস্থিতিতে বলেন যে, পাক বে-তে ব্যাপকহারে স্পিডবোট তৈরি হচ্ছে— যে স্পিডবোট দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নদীপথে অতিদ্রুত চলাচল করতে পারবে। যে কোনো মূল্যে এই স্পিডবোট প্রকল্পটি ধ্বংস করতে হবে। আমাকে পাক বে ডকইয়ার্ডের একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরির দায়িত্ব দেয়া হয়। শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত পাক বে ডকইয়ার্ডের একটি মডেল ৬/৭ দিনের মধ্যে তৈরি করতে সক্ষম হই, অতঃপর সেক্টর কমান্ডার পাক বে অপারেশনের দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত করেন। আমিসহ ভারতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়জন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ ও অস্ত্র আমাদের দেয়া হয়। ক্যাপ্টেন হায়দার বিদায়ের সময় সকলকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অপারেশনের সাফল্য কামনা করে বিদায় দেন। জুন মাসের ৮/৯ তারিখে আমরা আমাদের এলাকাতে আসি। পরে পাক বে ডকইয়ার্ডের প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নেই। পরবর্তী সময় সহযোদ্ধাদের সাথে পরামর্শ করে অপারেশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেই। ২৩ জুন রাত নয়টায় অপারেশনের দিন ও সময় নির্ধারণ করা হয় এবং অপারেশনের প্রয়োজন অতিরিক্ত বিশেষ কিছু দায়িত্ব কয়েকজন সহযোদ্ধাকে দেওয়া হয়। যেমন— যে সময় আমরা পাক বে তে অপারেশনে যাব ঠিক সে সময় ৩০ মিনিটের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা, যথাসময়ে আমরা পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পাক বে-তে অবস্থান নিলাম।

অতিদ্রুত যার যার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে চূড়ান্ত অভিযানে (এই অপারেশনে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ ব্যবহার করা হয়।) সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় স্পিডবোট তৈরি করার প্রকল্পটি। এখন নিরাপদে ফিরে আসার চিন্তা। নদীর পশ্চিম পাড়ে আমাদের আসতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধারণ চলাচলকারী মানুষের সাথে মিশে গিয়ে আমরা লক্ষণখোলা খেয়াঘাটে চলে আসি। খেয়াঘাটে ৫/৬টি নৌকা ভিড়ানো ছিল কিন্তু নদী পার করে দেবার মতো কোনো মাঝি ঘাটে ছিল না। আমরা কঠিন চিন্তায় পড়ে গেলাম। এমনি সময়ে এক যুবক দৌড়ে এসে বলে, আমি আপনাদের নদী পার করে দেব এবং সে নদী পার করেও দেয়। এই সাহসী যুবকের নাম জাফর উল্লাহ সাউদ (লক্ষণখোলা) পরে সে প্রশিক্ষণ নিয়ে একজন মুক্তিযোদ্ধার দায়িত্ব পালন করে। এই অপারেশনে আরও যারা অংশগ্রহণ করেন- নুরুল হক, শফিউদ্দিন, খোরশেদ, মহিউদ্দিন, আবু তালেব, অন্য যেসব সহযোদ্ধাদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে নারায়ণগঞ্জ, ফতুল্লা, সিদ্ধিরগঞ্জ, বন্দর এসব এলাকায় এতবড় সফল অপারেশন দ্বিতীয়টি হয়নি। এই সফল অপারেশনের খবর বিবিসি ও ভয়েজ অব আমেরিকা হতে ফলাও করে প্রচার করা হয় এবং আগরতলা শহরে মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধারা একটি আনন্দ মিছিল বের করে। আমি অপারেশনের তিনদিন পর মেলাঘরস্থ আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টারে যাই। সময় রাত ন'টা। চেকপোস্ট থেকে আমাকে ভিতরে যেতে দেয়া হচ্ছে না। অনেক অনুরোধ করে চেক পোস্টে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মীদের প্রধানকে বিনীতভাবে অনুরোধ করায় ক্যাপ্টেন হায়দার এর নিকট খবর দেয়া হয় যে, আমি চেক পোস্টে অবস্থান করছি। কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্যাপ্টেন হায়দার নিজে জিপ চালিয়ে চেক পোস্টে চলে আসেন। জিপ থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরে জিপে নিয়ে আসেন এবং মুহূর্তের মধ্যে আমরা হেডকোয়ার্টারে চলে আসি। বহু আলোচনা এবং আনন্দ উল্লাস শেষে গোসল ও রাতের খাবার সারা হয়। পর দিন সকালে ক্যাপ্টেন হায়দার আমাকে বলেন, তুমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হও, বেলা ১১টার সময় তোমাকে স্যার (ক্যাপ্টেন শওকত, বর্তমানে কর্নেল শওকত এমপি) নিয়ে যাবেন, ৯১ বিএসএফ হেডকোয়ার্টার্সে। ওখানে ভারতীয় উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তারা পাক বে'র সফল অপারেশন সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্ট গ্রহণ করবেন। যথাসময়ে শওকত স্যার আমাকে নিয়ে জিপযোগে রওনা দেন। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ভারতীয় বড় মাপের একটি সেনানিবাসে পৌঁছি। পরে জানতে পারলাম, এটাই ৯১ বিএসএফ হেডকোয়ার্টার্স। একজন অফিসার এসে স্যারকে স্যালুট করলো। স্যারসহ আমাকে একটি সজ্জিত বসার ঘরে বসালেন এবং চা বিস্কুটে আপ্যায়ন করলেন। ৮/১০ মিনিট পর অন্য একজন অফিসার এসে জানতে চান, মি. গিয়াস উদ্দীন কে? শওকত স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। বিনয়ের সাথে একটি ইংরেজি পত্রিকা শওকত

স্যারের হাতে দিয়ে আমাকে ওনার সাথে নিয়ে আসলেন এবং অতি সুন্দর সুসজ্জিত একটি বড় কামরায় আমাকে নিয়ে যান। মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন এবং অনেক স্নেহ করেন। ঐ সময় সোফাতে বসা দুজন সেনা কর্মকর্তা (লে. জেনারেল সগত সিং এবং মে. জেনারেল আরডি হীরা)র সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর শুরু হয় পাক বে অপারেশন সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা। আলোচনার শেষ পর্যায়ে উনি জানতে চান, আমি কী চাই এবং আমরা কী চাই? আমার কমান্ডারের পরামর্শ অনুযায়ী আমার একটাই চাওয়া ছিল আমি অস্ত্র চাই এবং আমাদের অস্ত্র চাই। দীর্ঘ নব্বই মিনিটের রিপোর্টটি শেষে উনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন, অস্ত্র দেবো এবং যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যা যা প্রয়োজন সবই দেবো। একথা বলে ভারতীয় ২০০ টাকা, ২ কার্টন পানামা সিগারেট, ৪ কার্টন উন্নত মানের বিস্কিট, উপহার সামগ্রী আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, বেটা আমার পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র উপহার তোমাদের জন্য। পুনরায় তিনি আশ্বস্ত করেন সব ধরনের অস্ত্র তোমাদের দেয়া হবে। তারপর সকলের সাথে করমর্দন শেষে তিনি আমাকে ও শওকত স্যারকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেন। প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে আমাদের সাথে ব্রিগেডিয়ার সাবেগ সিং এর পরিচয় হয়। সকলের সাথে ভালো সম্পর্ক ছিল। এই সফল অপারেশনের কৃতিত্ব আমার সকল সহযোদ্ধার। বলা বাহুল্য পাক বে ডকইয়ার্ডে আমার বড় ভাই প্রথম শ্রেণির একজন শিপবিল্ডার (ঠিকাদার) ছিলেন। সেই সুবাদে পাক বে ডকইয়ার্ডে আমার যাওয়ার সুযোগ ছিল।

এ লেখাটি লিখতে গিয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি কে ফোর্স কমান্ডার মরহুম মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ, বীর উত্তম ও লে. কর্নেল মরহুম এটিএম হায়দার, বীর উত্তমের নাম।

গানবোট অপারেশন

ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও শীতলক্ষ্যা নদীর মিলনস্থল শম্ভুপুরাটেক (কলাগাছিয়া) এ আমাদের অবস্থান। ২৫ অক্টোবর, ১৯৭১ বিভিন্ন সূত্রে আমরা খবর পাই যে, নদীর এই মোহনায় সবসময় গানবোট টহল দেয়। ঐদিন বিকেল ৫টায় ৫৭ মি.মি. ব্লেন্ডিসাইডসহ ৩০ জন মুক্তিযোদ্ধার একটি দল নিয়ে গানবোট অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সন্ধ্যার পর রাতের খাবার শেষে যার যার অবস্থানে যাই, সারারাত্রি কেটে গেল। কিন্তু ঐ রাতে গানবোট টহলে এল না। পরদিন অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর সকাল বেলা গোসল সেরে সকালের নাস্তা শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্রাম নিতে বলা হয়। ঠিক বেলা ১১টার সময় এক কৃষক এসে আমাকে জানাল, ভাই গানবোট আসতেছে। মুহূর্তের মধ্যে ব্লেন্ডিসাইডসহ মুক্তিযোদ্ধাদের যার যার অবস্থানে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়। গানবোট আমাদের আয়ত্তে আসার সাথে সাথে

ব্রেন্ডিসাইড গানার ফায়ার করল। মোট তিনটি গোলা নিক্ষেপ করা হয়। গানবোটে গোলা আঘাত করার সাথে সাথে গানবোটটি ঘুরে যায়, শুরু হয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে গোলাগুলি। মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত গানবোটটি বাঁকা হয়ে নদীর উত্তর দিকে (যেখানে আমাদের অবস্থান ছিল) আস্তে আস্তে আসতে থাকে। সাহসী বীর যোদ্ধাদের গুলিতে ৬/৭ জন পাকিস্তানি হানাদার মারা যায়, এর মধ্যে দুইজনকে নদীতে পড়তে আমরা অনেকেই দেখেছিলাম। পরমুহূর্তে আমরা দেখতে পাই মুন্সিগঞ্জ টার্মিনাল থেকে অন্য একটি গানবোট বৃষ্টির মতো গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত গানবোটটিকে রক্ষার জন্য অতিদ্রুত ধেয়ে আসছে। আমরা আমাদের অবস্থান ত্যাগ করলাম এবং নিরাপদ আশ্রয়ে চলে আসলাম।

অংশগ্রহণকারী সহযোদ্ধা গানার আতাউর, মতিন, বাতেন, নূরুজ্জামান, সবুজ, কুতুব, মিলন, পুতুল, বাবুল, সামছুদ্দিনসহ আরো অনেকে। দ্রুত লিখতে গিয়ে অনেক সহযোদ্ধার নাম মনে করতে না পারায় আমি তাদের নিকট ক্ষমা চাইছি।

মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দীন, বীর প্রতীক

জন্ম : ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯। ১৯৬৫ সালে এসএসসি পাস করে সরকারি তোলারাম কলেজ থেকে যথাক্রমে ১৯৬৭ সালে এইচএসসি ও স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। হৃদযন্ত্রের ব্যাধিতে ঢাকার মিরপুর হাসপাতালে মারা যান ৫ই ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে। অসম সাহসী গিয়াসউদ্দীন অসাধ্য সাধন করে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত লেখাটি আমার অনুরোধে তিনি লিখেছিলেন। লেখাটি আকারে ছোট, আজ সেটাই অমূল্য।

সাফল্য নিয়ে ক্যাম্পে ফিরি

শাহজামান মজুমদার, বীর প্রতীক

সাতছড়ির ঘটনার কয়েকদিন পর রেললাইনের পাশের শাহপুর তেলিপাড়া রেল স্টেশনের মাঝের রাস্তায় আমরা মাইন পোঁতার সিদ্ধান্ত নিই। আমরা আগে থেকে ওই এলাকায় শত্রুর অবস্থান সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিই। তারপর মাইন পোঁতার জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করি। আমাদের মতো পাকিস্তানিরাও তেলিপাড়ার কেন্দ্রে স্থায়ী ব্যূহ তৈরি করেছিল। এছাড়া আশপাশের অন্য কোনো চা-বাগানে ওদের স্থায়ী কোনো ব্যূহ ছিল না। তবে পাকিস্তানিরা এসব এলাকায় নিয়মিত টহল দিত। আমরা এক কিলোমিটার পথ হেঁটে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত পার হয়ে গাছপালাবেষ্টিত কুঁড়েঘরের সারি পেলাম। কুঁড়েঘরগুলোর পিছনে কাদায় ভরা ধানক্ষেত। সেই কাদা-পানি ভেঙে প্রায় ৩০০ মিটার পথ পার হয়ে রেললাইন। এই রেললাইন এবং এর পাশের মাটির রাস্তাটা ভালোভাবেই পর্যবেক্ষণ করি।

গাছের আড়ালে আমরা লুকিয়ে রেললাইন আর মাটির রাস্তাটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে কিছু দূর পর পর অনেকগুলো বাংকার দেখা যাচ্ছিল। বাংকার খালি কিনা বুঝতে পারছিলাম না। যদি ওগুলোতে লোক থাকে তবে এই ভেবে—আমরা কুঁড়েঘরের ভেতর গাছের আড়ালে বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রায় এক ঘণ্টা পর আমাদের বামদিকে অবস্থিত শাহপুর স্টেশনের দিক থেকে একটা পিকআপ আসতে দেখি। পিকআপটা আমাদের সামনেই একটা বাংকারে এসে থামলে বাংকার থেকে একজন খাকি পোশাক পরা পাকিস্তানি সেনা বেরিয়ে আসে এবং পিকআপে বসা সেনাদের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। দূরত্বের কারণে আমরা তাদের কথোপকথন শুনতে পাইনি। কিছুক্ষণ পর পিকআপটা চলে যায়। লোকটা আবার বাংকারে ঢুকে পড়ে। এখানে পরপর তিনটি বাংকার থাকলেও পিকআপটা একটার সামনে থামার কারণে আমরা আন্দাজ করতে পারি বাংকারগুলো অধিকাংশই ফাঁকা। হঠাৎ করেই একজন সেনা আগের বাংকারটা থেকে বের হয়ে ধীর পায়ে বাংকারের সামনে হাঁটতে লাগল। দূর থেকে আগে যাকে দেখেছিলাম, সেই লোকটাকেই মনে হলো। কিছুক্ষণ পরেই

আরও একজন বাংকার থেকে বেরিয়ে তার সঙ্গে যোগ দেয়। দুজনই সিগারেট জ্বালিয়ে বাংকারের ওপরে বসে আয়েশ করে সিগারেট টানতে থাকে।

ওই দিন আমাদের কাজ ছিল মাইন পোঁতার জায়গা নির্বাচন করা, বাংকার আক্রমণ করা না। যদিও দুজন শত্রু সেনাই আমার রাইফেলের নাগালের মধ্যে ছিল, কিন্তু ক্যাপ্টেন মতিনের কঠোর দৃষ্টি আমাকে নিরুৎসাহিত করে। তিনি আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করার অনুমতি দিলেন না। কারণ, তিনি চাচ্ছিলেন না পাকিস্তানি বাহিনী জানুক যে আমরা এই এলাকায় ঘোরাফেরা করছি।

আমাদের কাজ শেষে যখন চলে যাব, ঠিক তখনই আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম, যেটা আসছিল আমাদের পেছনে বাঁশবনের দিক থেকে। গুলির আওয়াজ শুনেই দুই পাকিস্তানি সেনা ত্বরিৎগতিতে বাংকারে ঢুকে গেল। আমরা ঠিক করলাম গোলাগুলি কোথায় হচ্ছে দেখা দরকার।

পেছনে বাঁশবাগানের দিকে আসতেই দেখলাম যে আমাদের একটা দলের সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর একটা টহল দলের বন্দুকযুদ্ধ চলছে। সম্ভবত পাকিস্তানিরা তেলিয়াপাড়া স্টেশন থেকে বাঁশবনের দিকে আসছিল আর তখনই আমাদের একটা টহল দলের সামনে পড়ে যায়। দুটো টহল দলই প্রায় সমান শক্তিধর এবং পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা ঠিক করলাম গোপনে শত্রুর ডানদিক থেকে অগ্রসর হয়ে শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ চালাব। যেহেতু আমাদের কাছে কোনো ওয়াকিটকি ছিল না তাই আমাদের পরিকল্পনার কথা যুদ্ধরত কমরেডদের জানাতে ব্যর্থ হই।

আমরা বাঁশবাগানের উদ্দেশে দৌড়াতে শুরু করি। এখানে কোনো রাস্তা নেই, আমরা দৌড়াচ্ছিলাম উঁচু-নিচু জমি, মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা জমির ওপর দিয়ে। মাঝেমধ্যে দু-একটা গাছ চোখে পড়ছিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা পাকিস্তানিদের অবস্থান থেকে রাইফেলের নাগালের দূরত্বে পৌঁছে গেলাম। এর মধ্যেই আমাদের যুদ্ধরত কমরেডরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেল এবং নতুন উদ্যমে গুলি করতে লাগল।

আমাদের দশজনের দলের সঙ্গে ছিল একটা লাইট মেশিনগান, দুটো চায়নিজ ৭.৬২ এসএমজি এবং কয়েকটা সেমি অটোমেটিক রাইফেল। এগুলো নিয়ে আমরা শত্রুকে লক্ষ্য করে এমনভাবে অবস্থান নিলাম যে, ওদের ওপর গুলি চালানোর পরেও ওরা আমাদের অবস্থান সহজে শনাক্ত করতে পারল না। আমাদের আকস্মিক হামলায় ওরা ঘাবড়ে গেল। দুই দিক থেকে আক্রমণ আসায় শত্রুপক্ষ একদম নাজুক অবস্থায় পড়ে গেল। ওদের বাঁচার একমাত্র খোলা রাস্তা হচ্ছে বাঁশবনের মধ্য দিয়ে পালানো।

আমি মাটিতে একটু গর্ত মতো জায়গায় অবস্থান নিয়ে আমার রাইফেলের সাইটটা ৩০০ মিটার দূরত্বের জন্য প্রস্তুত করলাম। শত্রুর কাছে দুটো এলএমজি

ছিল, যা দিয়ে ওরা একবার আমাদের দিকে আর একবার আমাদের অপর দলের দিকে গুলি চালাচ্ছিল। আমি শত্রুর নিশানা ঠিক করলাম এবং গুলি ছুঁড়তে শুরু করি। আমার দিকেও গুলি আসছিল কিন্তু তার অধিকাংশই যাচ্ছিল আমার মাথার ওপর দিয়ে।

পাঁচ মিনিট সংঘর্ষ চলার পর আমরা গোলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। হাউটসার (আর্টিলারি গান) থেকে পর পর দুটি বুম বুম আওয়াজ শোনা গেল। সেগুলো আমাদের ১০০ মিটার পেছনে এসে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো কিন্তু পেছনে পড়ায় আমাদের কোনো ক্ষতি হলো না। ফাঁকা স্থানে পাকিস্তানিদের বেশি সময় ধরে গোলাগুলি করার এই হচ্ছে বিপদ। পাকিস্তানিদের সেনাদলকে সাহায্য করার জন্য ওদের আর্টিলারি সবসময় প্রস্তুত থাকে। এখন এই ফাঁকা স্থানে আমাদের দুই দলেরই অবস্থা খারাপ। আর্টিলারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কোনো ব্যবস্থাই নেই। আরও দুটো গোলা ছোঁড়ার আওয়াজ শোনা গেল, তবে দুটোই আমাদের মাথার ওপর দিয়ে আগের মতো পেছনে কোথাও গিয়ে পড়ল। এর মধ্যে আমাদের আক্রমণ শ্লথ হয়ে পড়লে পাকিস্তানি বাহিনী বাঁশবনের দিকে পালাতে শুরু করল। এ অবস্থায় সীমান্তের দিকে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকল না। ক্যাপ্টেন মতিন হাত নেড়ে সবাইকে ফিরে আসার সংকেত দিচ্ছিলেন। আরও দুটো গোলা মাটিতে বিস্ফোরিত হলে এখানে কয়েক মুহূর্ত আগেই আমরা ছিলাম। আরও দুটো গোলা, এ দুটোও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সীমান্তের কাছাকাছি কোথাও পড়ল। কিন্তু এই শেল দুটো ছিল এয়ারব্লাস্ট। যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে এগুলো এয়ারব্লাস্ট, তখন সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করলাম। আমরা দিক পাল্টে কোনাকুনিভাবে সীমান্তের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী নিরাপদে বাঁশবনে পৌঁছে আবার আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু ততক্ষণে আমরা শত্রুর অস্ত্রের সীমার বাইরে চলে গেছি। ফলে তাদের ছোঁড়া গুলি আমাদের পর্যন্ত পৌঁছল না।

যখন আমরা সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়লাম, তখন দেখলাম আমাদের একজনের বাঁ পায়ে এয়ারব্লাস্টের স্প্লিন্টার লেগে অনর্গল রক্ত বের হচ্ছে। আমাদের জিপটা কাছাকাছি থাকায় তাকে দ্রুত হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো যদিও গুরুতর আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের হেডকোয়ার্টারে ছিল না। আমি নিশ্চিত শত্রুদের অনেকেই হতাহত হয়েছে। বিশেষ করে আমরা যখন ওদের পাশ থেকে আক্রমণ করছিলাম। তবে দুঃখজনক যে এ রকম বিক্ষিপ্ত গোলাগুলির সঠিক ফলাফল নিশ্চিন্তভাবে যাচাই করে দেখা সম্ভব হয় না।

যুদ্ধ চলাকালীন মাথা ঠাণ্ডা রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ না। এটা আয়ত্ত করতে নিয়মিত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। এটা আয়ত্ত করার সবচেয়ে ভালো

এবং দ্রুত প্রক্রিয়া হলো যুদ্ধক্ষেত্র, তবে সেজন্য প্রশিক্ষণার্থীকে চরম মূল্য দিতে হতে পারে। কেননা ট্রেনিংয়ের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো দ্বিতীয় সুযোগ থাকে না। আত্মরক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আর এই প্রবণতাই অধিকাংশ মানুষকে বিপদে পড়লে নিরাপত্তা খুঁজতে বাধ্য করে। যখন বুলেট কারও দিকে ছুটে আসতে থাকে তখন একধরনের যুক্তিহীন আতঙ্ক গ্রাস করতে চায়। ভয় হচ্ছে মানুষের সহজাত আদিম অনুভূতি, সেখানে যুক্তি বা বিবেচনার মতো শিক্ষালব্ধ বিষয়গুলো ঠিক কাজ করে না। আমার মনে আছে, প্রথমবার বুলেটের মুখোমুখি হয়ে কী ভয়ই না আমি পেয়েছিলাম। চারদিকে বুলেটের হিসহিস শব্দ আতঙ্ক ছড়াচ্ছিল। আমি যেন কেমন ভয়ে জমে যেতে লাগলাম। আমার পা মনে হলো মাটিতে গেড়ে বসেছে, নড়াতে পারছি না। ভয়কে জয় করা না গেলে এই লাগামহীন ভয় মানুষকে পঙ্গু করে দেয়, ভয় ক্রমেই এক মানুষ থেকে অন্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে এবং একবার আক্রান্ত করতে পারলে প্রায় মানুষকে অসাড় করে ফেলে। আমি এটা অনেকবার ঘটতে দেখেছি। প্রথম প্রথম নিজেও এর শিকার হয়েছি। অধিকাংশ যোদ্ধাই কয়েকটা যুদ্ধের পর এই ভয় কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়। আমার মতে, এক্ষেত্রে দলনেতার একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। তার দায়িত্ব কেবল সদস্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণই নয়, বরং গোটা দলকে সাহস জোগান এবং দলপতির মতো আচরণ করা। একজন যোগ্য নেতার কাজ হচ্ছে তার মধ্যকার সাহস ও শক্তি দলের অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করা এবং দলের সবার কাছাকাছি এসে দলীয় বন্ধনকে মজবুত করা। নবাগতরা তাদের ঊর্ধ্বতনদের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ফলে একজন সাহসী নেতার পক্ষে সম্ভব নির্ভীক যোদ্ধা তৈরি করা অন্যদিকে হীনম্মন্য নেতৃত্ব থেকে কেবল দুর্বল ও কাপুরুষেরই সৃষ্টি হয়।

এজন্য যেসব দলনেতা বুদ্ধিমান ও সাহসী, তাদের অধীনস্থরা অতি দ্রুত এসব ভয়-ভীতিজনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারে। এদিক দিয়ে আমি বেশ ভাগ্যবান বলা যায়, ট্রেনিং শেষ করার পরে সেলিম ভাইয়ের মতো একজন সাহসী ও সমর্থ মানুষকে নেতা হিসেবে পেয়েছিলাম। লে. মোর্শেদও ছিলেন একই প্রকৃতির মানুষ। সর্বোপরি ক্যাপ্টেন মতিন এবং তাঁর ইপিআর বাহিনী যে সাহস ও বীরত্বের নজির স্থাপন করেছিলেন, তা ছাড়িয়ে যাওয়া কঠিন। একটা দলের সঙ্গে কিছুদিন থাকলে মানুষের আচার-আচরণের কিছু পরিবর্তন আসে এবং সে শিগগিরই দলের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়। তার মানে এই নয় যে আমার মধ্যে ভয় ছিল না। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে চেষ্টা করেও আমার পক্ষে হলিউড হিরোদের মতো হয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। বুঝতে পারলাম, বাস্তব যুদ্ধ সিনেমার যুদ্ধের মতো নয়। আমাদেরও কিছু হলিউডের মতো হিরো ছিলেন। আমাদের দুলা মিয়া ছিলেন। আমি আরেকজনের কথা পরিষ্কার মনে করতে পারি,

মফিজ নামের সাবেক ইপিআরের হাবিলদার। শান্ত, ধীর-স্থির এবং স্বল্পভাষী একজন মানুষ, এক কথায় একটু ভাবলেশহীন। কিন্তু সে যখন তার মাঝারি মেশিনগানটা ব্যবহার করত তখন সে হয়ে উঠত অন্য মানুষ। সে যখন একটা অবস্থান থেকে যুদ্ধ করত, সে জায়গা থেকে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উঠত না, অবস্থা চরম প্রতিকূল হলেও। মফিজ দুলা মিয়ার মতো ছিল না, সে ছিল নম্র এবং নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকা একজন মানুষ। তার ঊর্ধ্বতনরা আমায় বলেছেন যে সাধারণ সময়ে সে ছিল খুবই নিরীহ প্রকৃতির লোক, যাকে কোনো কোনো সময় অনেকে নিরুৎসুক বলেও মনে করত এবং ফলে তিরস্কারের পাত্র ছিল।

অনেক অফিসারকেই সাধারণ সময়ে দক্ষ ও পরিপাটি মনে হলেও বিপদের সময় বা শত্রুর মুখোমুখি হলেই তারা তাদের এই কৃত্রিম ভাবমূর্তি আর ধরে ধরে রাখতে পারতেন না। জীবন-মরণের টানাপোড়েনে তাদের এই উদ্দীপ্ততার খোলস খুব দ্রুতই ভেঙে পড়ে। একজন মানুষ যখন চরম বিপদের মুখোমুখি হয় তখন সকল ভদ্রতা ও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা বিফলে যায়। নকল আবরণ ভেদ করে আসল চেহারা দ্রুতই বেরিয়ে আসে এবং নিজের ভেতরকার আসল মানুষটাকে মেলে ধরে। এটাই মানুষের ভেতরকার প্রকৃত সত্তা। যা-ই হোক, আমরা ঘাঁটিতে ফিরে এসে অস্ত্র পরিষ্কার শেষে বসে বসে সারা দিনের কর্মকাণ্ড নিয়ে আলাপ করতে লাগলাম। অভিযান পরবর্তী এই আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর মাধ্যমে আমরা আমাদের ভুলগুলো খুঁজে বের করতে পারতাম। এই আলোচনার নতুন নতুন কৌশল ও পরিকল্পনার জন্ম হতো এবং আমি পারতপক্ষে এই আলোচনায় অনুপস্থিত থাকতাম না।

রেললাইন সংলগ্ন এলাকা পর্যবেক্ষণ শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ওই দিন সন্ধ্যায় আমরা মাইন পুঁতবো। এ অভিযানের জন্য ক্যাপ্টেন মতিনের নেতৃত্বে কুড়িজনের একটা দল তৈরি হলো। রাত বলে আমাদের ডান দিকে (বাঁশবনের দিকে) নিরাপত্তার জন্য বাড়তি টহল দলের প্রয়োজন ছিল না, কেননা পাকিস্তানিরা সাধারাণত রাতের বেলায় সীমান্তের খুব একটা কাছাকাছি আসে না।

সূর্যাস্তের পরপরই রাতের খাবার সেরে নিয়ে আমরা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হলাম। জনমানবশূন্য একটা এলাকা দিয়ে সীমান্ত পার হলাম। কেননা আমরা সন্দেহ করতাম সীমান্ত এলাকার বাংলাদেশি রিফিউজিদের মধ্যে পাকিস্তানিদের গুপ্তচর থাকতে পারে। যখন সীমান্ত পার হচ্ছিলাম তখন পুরোপুরি অন্ধকার, এই গাঢ় অন্ধকারে রেললাইনের পাশের সেই কুঁড়েঘরের সারি খুঁজে পেতে একটু কষ্টই হলো। তাছাড়া কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম।

আমরা যখন পৌঁছলাম তখন আকাশ পরিষ্কার, অসংখ্য তারা হীরার মতো ঝলমল করে স্বর্গীয় দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। চারিদিকে সুনসান নীরবতা মাঝেমধ্যে দূর

থেকে রাতজাগা পাকিস্তানি প্রহরীদের রাইফেলের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শব্দ শুনে অস্ত্রের ধরনের আন্দাজ করতে আমরা বেশ পারদর্শী হয়ে উঠি। রাইফেলের রিপোর্ট (আওয়াজ) এবং সুপারসনিক বুলেটের তীক্ষ্ণ আওয়াজের মধ্যবর্তী সেকেন্ড গুনে আমরা রাইফেলের ধরন নির্ণয় করতে পারতাম। যেমন এ৩ রাইফেলের আওয়াজ ছিল স্বতন্ত্র প্রথমে টাক তারপর ড্রুম। চায়নিজ রাইফেলের আওয়াজ কিছুটা কোমল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আওয়াজ এবং গুলি ছোঁড়ার গতি থেকে আমরা অস্ত্রের ধরন শনাক্ত করতে পারতাম। কুঁড়েঘরগুলোর কাছে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন মতিন সবাইকে আরও একবার আমাদের মিশন সম্পর্কে বিস্তারিত বলে দিলেন। অন্ধকার রাতে কিছুই দেখা যায় না, তাই আমরা ধৈর্য ধরে কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার চেষ্টা করলাম। অস্বাভাবিক কোনো আওয়াজ শোনা যায় কিনা। তখন রাত প্রায় ৮টা বাজে।

দিগন্তের বিপরীতে আমাদের সামনের তিনটি বাংকারের অবয়ব অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ পরে একটা গাড়ির হেডলাইট দেখতে পেলাম। গাড়িটা আমাদের দিকে আসছে। রেললাইন পাহারা দেওয়ার জন্য এটা পাকিস্তানিদের ভ্রাম্যমাণ টহল। আমরা এটাকে নিরাপদেই যেতে দিলাম। আমরা জানতাম এটা অন্যদিক থেকে ঘুরে আসতে অন্তত ৩০ মিনিট সময় লাগবে। লক্ষ করলাম যে গাড়িটা আমাদের সামনে থাকা তিনটি বাংকারের একটার সামনেও থামল না। আমরা ধরে নিলাম যে সামনের তিনটি বাংকারই খালি। গাড়িটা অন্য কোথাও না থেমে একই গতিতে উঁচু-নিচু রাস্তা দিয়ে হেলে-দুলে এগিয়ে যেতে লাগল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই হেডলাইটের আলো অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত হলো ২০ জনের মধ্যে ছয়জন যাবে মাইন লাগাতে আর বাকিরা এই ঘরগুলোর কাছে প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান নিয়ে থাকবে। যদি কোনো সমস্যা হয় তাদের দায়িত্ব পেছন থেকে গুলি করে আমাদের রক্ষা করা এবং নিরাপদে পেছনে ফিরে আসতে সাহায্য করা। আমরা দুটো এলএমজি সঙ্গে নিলাম এবং দেখে নিলাম যে তা প্রস্তুত (cocked) করা আছে কিনা। কারণ, রাতের এই পিনপতন নীরবতায় এলএমজি প্রস্তুত করার শব্দ একটা ছোট ক্যালিবারের পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার শব্দের সমান। রাইফেল এবং বুট রেখে একট ছোট কোদাল, ছোট একটা লাঠি এবং ট্রাকের একটা টায়ার নিয়ে আমি রওনা হলাম।

ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে খুব শান্তভাবে ধীরগতিতে আমরা রাস্তার দিকে এগোচ্ছিলাম। ধানক্ষেত পানিতে ভেজা এবং কাদায় ভরা, ফলে প্রতিবার পা ফেলতেই কাদায় পা আটকে যাচ্ছিল। আঠালো মাটিতে পা পিছলে একবার আমি প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে ভারসাম্য রক্ষা করি।

শেষের ৫০ মিনিট আমরা খুবই ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম, প্রতিবার পা ফেলার আগে সাবধানে ও সতর্কতার সঙ্গে পায়ের সম্পূর্ণ ভর কাদার মধ্যে ফেলছিলাম। কেননা হঠাৎ করে পা ফেললে কাদা-পানির মধ্যে একটা প্যঁচ প্যাঁচ শব্দ হয়, যেটা রাতের নীরবতায় অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়। ধানক্ষেত থেকে রেললাইন ও মাটির রাস্তাটা প্রায় ছয় ফুট ওপরে। ধানক্ষেত পার হয়ে খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে আমরা মাটির রাস্তার ওপর উঠলাম। আমরা দুটো বাংকারের প্রায় মাঝামাঝিতে আছি, আর সামান্য পথ হামাগুড়ি দিয়ে দুই বাংকারের মাঝখানে একটা জায়গা মাইন লাগানোর জন্য ঠিক করলাম। আমাদের থেকে ১৫ মিটার দূরত্বে দুই দিকে দুটো বাংকার। এলএমজি দুটো দুই বাংকারের দিকে মুখ করে বসানো হলো। খুব সন্তর্পণে কোনো রকম শব্দ না করে আমরা রাস্তার নরম মাটি খুঁড়তে শুরু করলাম।

রাস্তার ওপরে উঠতেই আমার হৃদকম্পন বাড়তে শুরু করে। উত্তেজনা, ভয়, আশঙ্কা, প্রতিশোধস্পৃহা আর লক্ষ্য অর্জনের সংকল্প, সবকিছু মিলিয়ে তখনকার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি খুব আতঙ্কিত ছিলাম। আমরা পাকিস্তানি বাংকারের এত কাছে যে, যে কোনো মুহূর্তে কিছু ঘটতে পারে; কেউ বাংকার থেকে বেরিয়ে এলে আমাদের দেখে ফেলতে পারে। যে গাড়িটা চলে গিয়েছিল, সেটা আবার ফিরে আসতে পারে। আবার নতুন কোনো যানবাহনও আসতে পারে। সুতরাং অনেক কিছুই ঘটতে পারে। আমি জানি না আমার সঙ্গের অন্যদের কেমন লাগছিল। তবে তাদের কারও মধ্যেই ভয়ের কোনো চিহ্ন দেখলাম না। সবাই সতর্ক, তবে ভীত নয়। আমি তাদের মতোই নিজেকে সংযত রেখে নিজের কাজে মন দিলাম। সাহস এবং ভয় উভয়ই সংক্রামক হয় এবং খুবই দ্রুত ছড়ায়।

আমি একটা ছোট কোদাল (spade) নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার দায়িত্ব ছিল মাইনের মাপমতো গর্ত খোঁড়া। আমাদের সঙ্গে আরও দুজনের কাছে কোদাল ছিল। আমরা গর্তগুলো খুঁড়ে তাতে মাইন বসালাম, বৃত্তাকার মাইনের কেন্দ্রে গোল মতো একটা গর্ত থাকে ডেটোনেটর লাগানোর জন্য, সেখানে সাবধানে, শব্দ না করে ডেটোনেটর লাগানোর পর স্পাইডারটার সতর্কতার সঙ্গে ঠিকভাবে ডেটোনেটরের ওপর বসিয়ে দিলাম। সব শেষে মাইনগুলো মাটি দিয়ে ঢেকে দিলাম। অন্য একজন এই মাটির ওপরে ট্রাকের টায়ার দিয়ে ছাপ দিয়ে ছিল। একদম শেষে আমি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া চটের বস্তা বের করে তাতে বাড়তি মাটিগুলো রাস্তা থেকে তুলে বস্তায় ভরে নিলাম। আমরা যেহেতু হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় উঠেছিলাম, তাই রাস্তায় আমাদের পায়ের কোনো ছাপ থাকল না।

রাস্তার একপাশে পাশাপাশি তিনটে মাইন পোঁতা হলো। আমাদের কাজ যখন প্রায় শেষ তখন হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মনে হলো, কেউ দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালাচ্ছে এমন শব্দ শুনলাম। আমার হৃদকম্পন

সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে দ্বিগুণ হয়ে গেল আর এক ধরনের অসাড়তা আমাকে কেমন যেন গতিহীন বা অনুভূতিশূন্য করে ফেলতে চাইল। আমার সব শক্তি প্রয়োগ করে কোনো রকমে নিজের ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করলাম।

সবাই একযোগে শব্দের উৎসের দিকে মাথা ঘোরালাম। বাংকারটা আমাদের ডানে। আমরা বুঝতেই পারিনি বাংকারের মধ্যে কেউ থাকতে পারে। মাত্র ১৫ মিটার দূরে বাংকারটিতে আবছা আলোর আভা দেখতে পেলাম। ভাগ্য ভালো বাংকারের গুলি করার ছিদ্রগুলো সামনের দিকে তাক করা, পাশের দিকে নয়। সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম এবং বাংকারের দিকে অস্ত্র তাক করে রাখলাম। আমাদের কারও সঙ্গে কোনো গ্রেনেড ছিল না। থাকলে হয়তো একটা গ্রেনেড বাংকারের ভেতরে ছোঁড়ার কথা ভাবা যেত। ক্যাপ্টেন মতিন আমাকে ইশারা করলেন ধানক্ষেতের দিকে ক্রলিং করে নেমে যেতে। এর মধ্যে আমরা টায়ারের ছাপ দেওয়া শেষ করেছি। শুধু কোদাল হাতে আমার পক্ষে নেমে যাওয়াটা সহজ ছিল কিন্তু যাদের হাতে অস্ত্র ছিল, বিশেষ করে এলএমজি নিয়ে কোনো শব্দ না করে নিঃশব্দে নেমে আসা খুবই কঠিন। যা-ই হোক, কোনোমতে তেমন কোনো শব্দ না করেই আমরা ধানক্ষেতের মধ্যে নামতে পারলাম। ধানক্ষেতে নামতে পেরে আমরা কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেলাম। খুব আস্তে আস্তে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আমরা কুঁড়েঘরগুলোর কাছে ফিরে এলাম। যখন কুঁড়েঘরে বসে জুতা-মোজা পরছি, তখন সেই টহল গাড়িটাকে অন্য দিক থেকে ফিরে আসতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পর পিকআপটা আমাদের পোঁতা মাইনের ওপর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলে গেল। আমরা জানতাম মাইন ফাটবে না। একটা নির্দিষ্ট ওজনের চাপ না পড়লে ট্যাংকবিধ্বংসী মাইন ফাটে না। অবশ্য একটা ছোট পিকআপ ট্রাক মাইনে পড়ুক তা আমাদের কাম্য ছিল না। আমরা আর দেরি না করে আমাদের ক্যাম্পের দিকে রওনা করলাম।

রাতে আর কিছুই হলো না। আমি ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম তাই ক্যাম্পে পৌঁছেই ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে প্রতিদিনকার মতো খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে যখন নিমের ডাল দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছি, ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ সকালের স্নিগ্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম কী ঘটেছে। যেখানে মাইন পোঁতা হয়েছে তা থেকে আমাদের ক্যাম্পের দূরত্ব প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হওয়া সত্ত্বেও ট্যাংকবিধ্বংসী তিনটে মাইন বিস্ফোরণের আওয়াজ এতই ভয়ানক যে আমরা সবাই সেই বিস্ফোরণ এত দূর থেকেও বেশ জোরেই শুনতে পেলাম। আমাদের ফাঁদে কী শিকার ধরা পড়ল, সেটা জানার জন্য সবাই উদগ্রীব হয়ে রইলাম। কাজেই তাড়াতাড়ি কোনো রকমে সকালের নাশতা সেরে আমরা কুঁড়েঘরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। এখন যেহেতু দিনের বেলা তাই

ক্যাপ্টেন মতিন ১০ জনের একটা দলকে আমাদের ডানদিকের সীমান্ত সংলগ্ন বাঁশঝাড়ের দিকে বসিয়ে নির্বিঘ্নেই আমরা কুঁড়েঘরগুলোর কাছে পৌঁছে গেলাম। সেখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতে পেলাম একটা পাঁচ টনি আর্মি ট্রাক বিধ্বস্ত হয়েছে। ট্রাকের সামনের বাঁ দিকের সম্পূর্ণ অংশ একেবারে উড়ে গেছে এবং ট্রাকটা রাস্তা থেকে উল্টে ধানক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে। আশপাশে কোনো পাকিস্তানি সেনা বা অন্য কোনো লোকজন দেখতে পেলাম না। দুর্ভাগ্যবশত এবারও আমরা পাকিস্তানি হতাহতের সংখ্যাটা জানতে পারলাম না। নিজেদের সাফল্যে খুশি হয়ে ফুরফুরে মনে কোনো ঝঞ্ঝাট ছাড়াই আমরা ক্যাম্পে ফিরে এলাম।

শাহজামান মজুমদার, বীর প্রতীক

সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করি

মো. আবুল খায়ের বিশ্বাস

২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রথম যে জেলাটি স্বাধীন হয়, সেটি পাবনা জেলা। স্বাধীনতার ঘোষণার পরপর ৩১ সদস্যের একটি সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ২৫ মার্চ পাবনায় শত শত বাঙালি হত্যা করার পর ২৮ মার্চ প্রবল উত্তেজনায় পাবনাবাসী ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ওপর। অস্ত্র না থাকলেও মেধা ও সাহসিকতার ওপর ভর করে পাবনা পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে হাজার হাজার মানুষ পুলিশ লাইন, টেলিফোন ভবন, ইপসিক শিল্পনগরসহ পাকিস্তানি বাহিনীর সব অবস্থানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ২৯ মার্চ পাবনা স্বাধীন হয়। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন অসংখ্য কিশোর মুক্তিযোদ্ধা।

১৯৭১ সালে আমার বয়স মাত্র ১৬ বছর। তখন পাবনার জিসিআই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। মার্চ মাস থেকে পাবনার হেমায়েতপুরের আমিসহ নয়জন সমবয়সী বালক যুদ্ধে যাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি। চারদিকে ভয়ের ছড়াছড়ি। সুযোগ পেলেই যেখানে সেখানে গোপনে মিটিং করি। সবশেষে মিটিংটি ৭ অক্টোবর হেমায়েতপুর মানসিক হাসপাতালের নার্স কোয়ার্টারের বটতলায়। এই দিনই সিদ্ধান্ত নেই বাড়ি থেকে বের হওয়ার। সিদ্ধান্ত মতো ৮ অক্টোবর সকাল আটটায় বেরিয়ে পড়ি। আমিসহ বাকি আটজন সাহসী বালক হলো মাহবুবুর রশিদ, এসএম আনসার আলী, নুরুল ইসলাম, আবদুর রশিদ, আতিয়ার রহমান, আবুল হোসেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন ছাত্র, দুজন শ্রমিক ও একজন বেকার ছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে চরঘোষপুর ও ডিগ্রির চর হয়ে ডিঙিনৌকায় পদ্মা পার হই। অতঃপর কুষ্টিয়ার মিরপুর থানা এবং চিতলমারির ওপর দিয়ে ধর্মদহ বর্ডারে পৌঁছাই পরদিন সকাল সাতটায়। সম্পূর্ণ পথ হেঁটে যাই। দীর্ঘ ২৩ ঘণ্টায় বিরামহীন যাত্রায় কেবল চিড়া খেয়ে পার করি। ধর্মদহ বর্ডার পার হলে সেখানে ভারতের নদীয়া জেলার কেচুয়াডাঙা ইয়ুথ ক্যাম্প। এই ক্যাম্পে উচ্চ প্রশিক্ষণের বাছাইয়ে চারজন বাদ পড়ে যান। আমি, আবদুর রশিদ, এসএম আজম, আনসার আলী ও নুরুল ইসলাম এই বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ হই। এখানে মোগল আমলের তৈরি অতি পুরনো এক মসজিদে শবে বরাতের নামাজ আদায় করি। দুই দিন

এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। ১৪ দিন পর গৌর থেকে উচ্চ প্রশিক্ষণের জন্য শিলিগুড়ির পানিয়াঘাটায় যাই। পাহাড়ি ঝরণার মাঝে এই ক্যাম্পে যুদ্ধ প্রশিক্ষণের জন্য ছিল উত্তম পরিবেশ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে সেখানে প্রায় ১৭ দিন উচ্চ প্রশিক্ষণে অংশ নিই। তিনটি প্লাটুনে মোট ৯০ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন। পানিয়াঘাটাতেই আমাদের F.F. নম্বর দেওয়া হয়। ১৭ দিন হায়ার ট্রেনিং শেষ করে অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য ৭ নম্বর সেক্টরের অন্তর্গত পশ্চিম দিনাজপুর জেলার তরঙ্গপুর আসি। এই সময় ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য ভারতীয় সেনাদের ট্রাক ও ভারতীয় রেল-ব্যবস্থা ব্যবহার করা হতো। পাঁচদিন তরঙ্গপুরে অবস্থান করে ৯০ জন যোদ্ধা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি ক্যাম্পে চলে আসি। মুর্শিদাবাদ জেলা কুষ্টিয়া জেলার চিতলমারি সীমানার অপর পাশে অবস্থিত। এখানে ঈদুল ফিতরে নামাজ পড়ি। নামাজ আদায় করে পুনরায় ক্যাম্পে ফিরে যাই। জলঙ্গিতে প্লাটুন আঞ্চলিক স্থানীয় এলাকার ভিত্তিতে বিন্যাস করা হয়। আমরা কিসমত প্রতাপপুর গ্রামের এসএম মাহবুবুর রশিদের প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত হই। প্লাটুন নম্বর ছিল ৩২১। ৭ নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান। ছয় দিন পর রাতের আঁধারে প্লাটুন ও ওয়্যারলেস সেটসহ চিতলমারি দিয়ে পাকশি হয়ে বাঘাইলে ঢুকে পড়ি। বাঘাইল পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অন্তর্গত। রূপপুর ও দাদাপুর হয়ে ভোরে চরকাতলা এসে পৌঁছাই বকুল ভাই (রফিকুল ইসলাম বকুল) বলেন, 'তোমরা এসেছ খুব ভালো হয়েছে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ তোমরা নিয়ে এসেছ। তোমাদের সঙ্গে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ আছে। আমি কয়েকদিন পরেই শানিড়দিয়ায় অবস্থানরত পাকিস্তানি ও নকশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।'

নকশাল বলতে সর্বহারা কমিউনিস্টদের বোঝায়, যাদের নামকরণ হয় ভারতের নকশালবাড়ি এলাকার নামানুসারে। নকশাল বাহিনীর সদস্যরাও আমাদের শত্রুপক্ষ ছিল। তারা সে সময় পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল।

শানিড়দিয়ার আঞ্চলিক যুদ্ধ

৩০ জন যোদ্ধা পাঁচ-ছয়টি দলে বিভক্ত হয়ে চরকাতলা এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে অবস্থান করি। সবকটি দলের থাকার জায়গা হলেও আমার দলের জায়গা পাইনি। আমরা অবস্থান নিই বাঁধসংলগ্ন মসজিদে। চরকাতলায় কিছুদিন অবস্থানের পর পরিস্থিতিতে বুঝে কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বকুল একটি মিটিং ডাকলেন। বললেন, 'আজ রাতেই শানিড়দিয়ার পাকিস্তানি নকশাল বাহিনীর ক্যাম্পে আক্রমণ করা হবে।' পরিকল্পনা অনুযায়ী রাত দুইটায় প্রত্যেকে নিজ নিজ অবস্থান গ্রহণ করি। নভেম্বরে ২৭ তারিখ, শীতের রাত। ভোর চারটায় শুরু হয় সম্মুখযুদ্ধ। চলতে থাকে প্রচণ্ড গোলাগুলি। সকাল প্রায় নয়টার দিকে আমার সামনে পাবনা

কৃষ্ণপুরের হামিদ খান আহত হন। দুইজন ধরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেন। এই সময় তাঁকে সাহায্য করতে চাইলে হামিদ ভাই বলেন, 'না না, তুই আসিস না। তুই যুদ্ধ চালিয়ে যা। এই যুদ্ধ অনেক দীর্ঘস্থায়ী হবে।'

হামিদ ভাইয়ের পায়ে গুলি লেগেছিল এবং সেখান থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। হামিদ ভাইকে একটা কুঁড়েঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সাত ঘণ্টায় মাত্র ৬০-৭০ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রায় ২০০ শত্রুর বিরুদ্ধে বিরতিহীন যুদ্ধ করার পর বেলা ১১টায় প্রত্যাহার করি। শেষে পাকিস্তানি বাহিনী কুঁড়েঘরটি পুড়িয়ে দেয় এবং হামিদ ভাই কুঁড়েঘরেই শহীদ হন।

হামিদ ভাইসহ এই যুদ্ধে সেলিম ও আমির হোসেন শহীদ হন এবং অনেকে গুরুতর আহত হন। আর শত্রুপক্ষের নিহত হয় ২২ জন।

সুজানগর স্বাধীনতা যুদ্ধ

শানিড়দিয়া যুদ্ধ শেষ করে আমরা পাঁচজন সহযোদ্ধা নভেম্বরের ২৯ তারিখ রাতের অন্ধকারে চরকাতলা থেকে নৌকাযোগে রওনা দিই সুজানগর থানার উদ্দেশে। সম্মুখযুদ্ধ ছাড়া প্রায় সবসময় চলাচল হতো রাতের বেলা। কারণ, দিনের বেলা শত্রুপক্ষের কড়া নজর থাকত। ভোরে সুজানগর পৌঁছলাম। এখানে চর ভবানীপুর গ্রামের মেহের মেম্বারের বাড়িতে অবস্থান করি। কাকডাকা ভোরেই শুরু হয় সুজানগর অপারেশন পরিকল্পনা। সেখান থেকে থানা ভবনের দূরত্ব প্রায় এক মাইল। এভাবে ভেঙে ভেঙে থানার আশপাশের এলাকায় প্রায় শতাধিক যোদ্ধা ছোট ছোট গ্রুপে অবস্থান গ্রহণ করেন। ১১ ডিসেম্বর মধ্য রাতে জেলা কমান্ডার রফিকুল ইসলাম বকুল, এফএফ কমান্ডার মকবুল হোসেন ও এফএফ কমান্ডার ইকবাল হোসেনের কমান্ডে পাকিস্তানি হানাদার বেষ্টিত সুজানগর থানায় শতাধিক মুক্তিযোদ্ধা জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে সশস্ত্র আক্রমণ করেন। উভয়পক্ষে প্রচুর গুলিবর্ষণ হয়। আমরা সাতজনের একটি গ্রুপ শত্রু বাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য থানা ভবন থেকে আধা মাইল দূরে পাবনা সদরমুখী রাস্তায় এমবুশ করি, যাতে শত্রুপক্ষ পাবনা সদর থেকে সুজানগর থানা ভবনে যোগ দিতে না পারে। বিকেলে শত্রু বাহিনীর একটি বিশেষ দল এমবুশের সামনে এসে পড়ে। মুহূর্তে আমরা তাদের ওপর আক্রমণ করি। প্রচুর গোলাগুলি হয়। গ্রেনেড ও শেল নিক্ষেপ হয় এবং দুজন পাকিস্তানি সেনা সেখানে মারা যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। সন্ধ্যায় আবার সুজানগর থানা ভবনে পাকিস্তানি সেনাদের সাহায্য করার জন্য শত্রুবাহিনীর আরও বড় একটি দল তাদের এমবুশের আওতায় আসে। পুনরায় গুলিবর্ষণ হয়। একটানা প্রায় দুই ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুবাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়।

এভাবে টানা তিনদিন ও তিন রাত যুদ্ধ চলার পর ১৪ ডিসেম্বর ভোরে সুজানগর থানা ভবন দখলে চলে আসে এবং আবু বকর, দুলাল, নুরুল ইসলামের জীবনের বিনিময়ে মুক্তিবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করি।

১৫ ডিসেম্বর রাতে সুজানগর থেকে পদ্মারচর হয়ে পাবনা সদর ও সদরচর এলাকায় অবস্থান নিই। পরিকল্পনা করি নতুন যুদ্ধের জন্য। তখনো আমরা জানি না ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। বিকেল সাড়ে চারটায় রেডিওতে জানতে পারি, কিছুক্ষণ আগে পাকিস্তানি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল নিয়াজি ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনাসহ ভারতীয় মিত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক অরোরার কাছে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আনন্দে বুক ভরে যায়। কণ্ঠ থেকে বিজয়ের উল্লাস বেরিয়ে আসে। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠি 'জয় বাংলা' বলে।

বিশ্বাস করতাম বাড়ি ফিরে যাব। ঠিক তা-ই হলো। ১৭ ডিসেম্বর আমি বাড়িতে ফিরে আসি। অপ্রত্যাশিত এক উপস্থিতি কেউ জানত না আমি ফিরব কিনা। বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা আমাকে গরুর দুধ খেতে দিলেন। যেন এই দুধের বিনিময়ে যুদ্ধে হারানো শক্তির পুনরুদ্ধার করি। জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে আমার দাদি। সবার মুখে হাসি আর আর চোখে জল। আনন্দের জল। ছেলে ফিরে পাওয়ার আনন্দ, স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

আমার প্রায়ই হামিদ ভাইয়ের সেই কথা মনে পড়ে। "তুই যুদ্ধ চালিয়ে যা।" সত্যি আজ আমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি দুর্নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে। সত্যি আজও আমাদের যুদ্ধ শেষ হয়নি।'

মো. আবুল খায়ের বিশ্বাস

ভয়শূন্য চিত্তে যুদ্ধ করি

মোঃ রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ ঢাকায় ছিলাম। ২৫ ও ২৬ মার্চে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা দেখে আমি বরিশালে আমার গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। আমার মায়ের কাছে সব ঘটনা খুলে বলি। আমি রেডিওতে শুনতে পাই ভারত আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করছে। মাকে বলি, আমি ভারতে যাব এবং ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধে অংশ নেব। মা এ কথায় আমাকে উৎসাহ দেন এবং আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে আমার ছোট মামা নিজামউদ্দিন আহম্মেদের সঙ্গে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দেন। মা আমাকে বিদায়ের সময় বলেন, 'মরলে বীরের মতো মরবি, ভীতুর মতো না বেঁচে বীরের মতো বাঁচবি। তোকে আমি আল্লাহর কাছে সঁপে দিলাম।' এ কথা বলে আমার মুখখানা আঁচল দিয়ে মুছে দিলেন। আমি এক পা দু পা করে ভারতের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করলাম। আর পেছন ফিরে ফিরে মায়ের মুখখানি দেখছিলাম। মা আমার পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি হাঁটছি আর ভাবছি আমি কি আর কখনো মায়ের মুখ দেখতে পাব? একসময় রাতের আঁধারে মায়ের মুখখানি ঢাকা পড়ে যায়। আমি মামা বাড়ি যাই, মামাকে নিয়ে সারা রাত হেঁটে গোপালগঞ্জের কাছাকাছি যাই। গোপালগঞ্জ ও যশোর জেলার মধ্য দিয়ে শিকারপুর বর্ডার পার হয়ে তিনদিন পর ১৩ এপ্রিলে ভারতে প্রবেশ করি। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলার রানাঘাটে ইয়ুথ ক্যাম্পে তিন মাস শারীরিক প্রশিক্ষণ নিই। এরপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে বীরভূম জেলার চাকুরিয়া সেনাঘাঁটিতে অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিই। দীর্ঘ ৩০ দিনের প্রশিক্ষণের পর আমাদের ১২ আগস্ট বসুরহাট টাকি ক্যাম্পে ৮ নম্বর সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিলের নিকট পাঠিয়ে দেয়। তিনি আমাদের ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তাঁর অধীনে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য আমাদের ৬৪ জনকে ৯ নম্বর সেক্টরের অধীনে তাঁর সঙ্গে বরিশালে পাঠান। বরিশালে আসার পথে আমরা ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে নড়াইল জেলার আড়পাড়া গ্রামে প্রথম যুদ্ধে অংশ নিই। এই যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক ক্ষতি সাধন করে আমরা

বরিশালের উদ্দেশে রওনা হই। বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার অন্তর্গত হাবিবপুর গ্রামে আমরা আমাদের ক্যাম্প স্থাপন করি। ২২ আগস্ট জানতে পারি, নদীপথে পাকিস্তানি বাহিনী আসছে। আমরা যেতে যেতে বেলা ১১টার সময় পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের পার হয়ে হার্তারবাজারে গিয়ে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাট করে। আমরা দেখতে পাই দুপুর একটার সময় পাকিস্তানি বাহিনী ফেরত আসছে। আমাদের এমবুশের সামনে পাকিস্তানি বাহিনীর দুটি গানবোট ও তিনটি লঞ্চ আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করি এবং এতে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পাকিস্তানি হানাদারদের ৪০ জন নিহত হয়। এই যুদ্ধে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কেউ আহত হননি। এই যুদ্ধের সংবাদ আকাশবাণী, ভয়েস অব আমেরিকা ও বিবিসি রেডিও প্রচার করে। এরপর আমরা বানারিপাড়া থানার জামান ভাইয়ের নেতৃত্বে সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নিই। এই যুদ্ধে আমরা পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের ব্যাপক ক্ষতি করি। এতে অনেক রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। এরপর ২৪ সেপ্টেম্বর বেণু বাবুর নেতৃত্বে আমরা আবার বানারিপাড়া যুদ্ধে অংশ নিই এবং এ যুদ্ধে অনেক পাকিস্তানি সেনা নিহত ও আহত হয়। ৩ অক্টোবর আমরা বাবুগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। এখানে রাত ১১টা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে বীর বিক্রম আলতাফ হোসেন শহীদ হন এবং আমাদের কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরসহ আমরা ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা আহত হই। গুলিতে আমিও আহত হই। এখানে পাকিস্তানি বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করি। রাজাকার ও পাকিস্তানি সেনাসহ ২০-২২ জন নিহত হয়। এরপর আমরা ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর নলছিটি থানার অন্তর্গত চাচির গ্রামে আসা পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে এমবুশের মাধ্যমে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই যুদ্ধে ১০০-এর ওপরে পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকার নিহত হয়। এরপর স্বরূপকাঠি থানার অন্তর্গত ইন্দিরহাট নামক গ্রামে সন্ধ্যা নদীতে ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনাদের গানবোটে আক্রমণ করি। এতে গানবোটটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং গানবোটের সব সেনা নিহত হয়। এরপর কাউখালী থানার কেউন্দিয়া গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই। পাকিস্তানি বাহিনী নদী দিয়ে পাঁচ দিক থেকে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। সেদিনটি ছিল পবিত্র শবে বরাতের দিন এবং সময় ছিল ভোর সাড়ে পাঁচটা। আমি, মর্টার জিয়া ভাই ও আরও তিনজন মর্টার জিয়া ভাইয়ের নেতৃত্বে একদল পাকিস্তানি সেনার প্রায় ৪০ জনের মুখোমুখি হই। আমরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আমার রণকৌশলে একসঙ্গে সাতজন পাকিস্তানি সেনা ও রাজাকারকে হত্যা করি ও অনেক সেনা আহত হয়। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে গানবোটে করে পালিয়ে যায়।

আমার সাহসে খুশি হয়ে মর্টার জিয়া ভাই আমার অনেক প্রশংসা করেন। এরপর বীর বিক্রম হক ভাইয়ের নেতৃত্বে ডিনামাইটের সহায়তায় গৌরনদী থানার আশুকাঠি ব্রিজটি উড়িয়ে দিই। এরপর শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে ২২ থেকে ২৭ নভেম্বর রাজাপুর থানা আক্রমণ করি। এ যুদ্ধে আমাদের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। ব্যাপক যুদ্ধের পর আমরা থানা দখল করতে সক্ষম হই। এছাড়া আরও ছোট-বড় অনেক যুদ্ধে আমি অংশ নিই। আমরা ৩ থেকে ৭ ডিসেম্বর বাকেরগঞ্জ থানা আক্রমণ করি। পাঁচদিনের যুদ্ধের পর আমরা বাকেরগঞ্জ থানা দখল করতে সক্ষম হই। এ যুদ্ধে আমার অনেক রণকৌশল ছিল, যা আমাদের থানা দখল করতে সহায়তা করে। এখানে অনেক স্বাধীনতাবিরোধী নিহত হয়। ১০-১১ ডিসেম্বর বিনা বাধায় বরিশাল শহরে প্রবেশ করি। ডিসেম্বরের শেষের দিকে দোয়ারিকা ও রহমতপুর বিমানবন্দর এলাকা থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর ১৫০ জন আত্মসমর্পণ করে। যুদ্ধের বীরত্বের জন্য আমাকে বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়। এই খেতাবের জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ।

মোঃ রফিকুল ইসলাম, বীর প্রতীক

তেঁতুলিয়া সাব সেক্টরের যুদ্ধ

মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক

মূর্তি ক্যাম্পের ট্রেনিং

মূর্তি ক্যাম্পের ট্রেনিং প্রথম বাংলাদেশ ওয়ার কোর্স ২৭ জুন, ১৯৭১, জলপাইগুড়ির মূর্তি চা বাগানে ট্রেনিং শুরু করে। তৎকালীন ১১টি সেক্টর থেকে মোট ৬১ জন ক্যাডেট এই কোর্সে যোগদানে সমর্থ হন। আমাদের মূলত যুদ্ধের কৌশল, গেরিলাযুদ্ধ, এক্সপ্লোসিভ ও অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। একটানা প্রশিক্ষণ ৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলতে থাকে। আমাদের পাসিং আউট প্যারেডে তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও যুদ্ধকালীন কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী উপস্থিত ছিলেন। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে আমরা কমিশন্ড প্রাপ্ত হই এবং আমাকে ৬ নম্বর সেক্টরে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। আমি ভজনপুরের ডিফেন্সে যোগ দিই। ভজনপুর ছিল তেঁতুলিয়া থানার সাব সেক্টর।

৬ নম্বর সেক্টর

৬ নম্বর সেক্টর গঠিত হয়েছিল বৃহত্তর রংপুর জেলা ও বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা নিয়ে। উইং কমান্ডার বাশার (মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার, বীর উত্তম) ছিলেন ৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার। এই সেক্টরকে পাঁচটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করে পাঁচজনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যথাক্রমে-সাহেবগঞ্জে কমান্ডার ক্যাপ্টেন নওয়াজেস আহমেদ, মোগলহাটের কমান্ডার ক্যাপ্টেন দেলওয়ার হোসেন, পাটগ্রামের কমান্ডার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান, চিলাহাটির কমান্ডার ফ্লাইট লে. ইকবাল রশিদ এবং তেঁতুলিয়ার কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার সদরুদ্দিন হোসেন।

৬ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার খাদেমুল বাশার আমাদের কমিশনিং প্যারেডে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমি, সেকেন্ড লে. মতিন চৌধুরী, সে. লে. আশফাক সামাদ ও সে. লে. আবদুল্লা ৬ নম্বর সেক্টরে নিয়োগ পেলাম। আমাদের সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাশার আমাদের চারজনকে অভিনন্দন জানালেন। তিনি আমাদের পেয়ে ভীষণ আনন্দিত হন। তাঁরই গাড়িতে করে আমরা চারজন উদ্দীপ্ত তরুণ পাটগ্রামের

বুড়িমারিতে উপস্থিত হই। সেখানে করা হয়েছিল ৬ নম্বর সেক্টরের হেডকোয়ার্টার। সব সাব-সেক্টর কমান্ডার এবং সেক্টর মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন মোসাহেব হোসেনসহ একটি কনফারেন্স ডাকা হলো। সবার সঙ্গে আমাদের চারজন সেকেন্ড লেফটেন্যান্টকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আমাকে ও মতিনকে তেঁতুলিয়া সাব সেক্টরে পোস্টিং দেওয়া হলো। কনফারেন্স শেষে সাব সেক্টর কমান্ডার সদরুদ্দিনের সঙ্গে তেঁতুলিয়ার ভজনপুরে পৌঁছালাম। আমরা ভজনপুর রাতে থাকলাম। সে রাতে আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার আমাদের এলাকায় যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্ভাব্য বিবরণ বুঝিয়ে দিলেন। পরদিন তিনি আমাদের দুইজনকে সোজা রণক্ষেত্রে নিয়ে উপস্থিত হলেন। পরিচয় করে দেওয়া হলো ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারে সঙ্গে। তিনি পদাতিক বাহিনীর অফিসার। যিনি কিছুদিন আগে পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দি ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানিদের ওই এলাকার সবচেয়ে দুর্ভেদ্য পোস্ট ছিল অমরখানা। তিনি ব্যাটালিয়ন কমান্ডার হিসেবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ওই এলাকার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে ছিলেন।

এ এলাকা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ২৩ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডে ছিল। যার হেডকোয়ার্টার ছিল সৈয়দপুরে। অমরখানা ছিল পাকিস্তানের শক্তিশালী ঘাঁটি। যার বাংকারগুলো ছিল কংক্রিটের। এই শক্ত ঘাঁটি প্রস্তুতের কারণ ছিল যাতে তেঁতুলিয়া দিয়ে আমাদের সেনারা ঠাকুরগাঁও হয়ে সৈয়দপুরের দিকে যেতে না পারে। তাই অমরখানা ছিল পাকিস্তানিদের সর্ব উত্তরের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতে ১ কোম্পানি ৪৮ পাঞ্জাবের সেনা, ১ কোম্পানি ৯ উইংয়ের ইপকাফ, রাজাকার ও মোজাহিদ ছিল। এখানে তারা নিয়মিত আর্টিলারি সাপোর্ট পেত। পাকিস্তানিদের এই ঘাঁটি চাউই নদীর পূর্ব তীরে ছিল। অন্যদিকে, মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি ছিল নদীর পশ্চিম পাড়ে।

আমাদের যে ব্যাটালিয়নের পোস্টিং দেওয়া হয়, সেই ব্যাটালিয়নের অধিকাংশ ছিল ৯ উইংয়ের ইপিআর ও কিছু ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেনা, পুলিশ ও আনসার। ২৫ মার্চ ৯ উইং ইপিআর ঠাকুরগাঁওয়ে পোস্টিং ছিল। কিন্তু যখন তারা জানল যে পিলখানায় ইপিআরের বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র অবস্থায় পাকিস্তানিরা গুলি করে হত্যা করেছে, তখন তারা সুবেদার মেজর কাজিম উদ্দিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং পরে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেয়।

অমরখানার প্রতিরক্ষা

ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার আমাদের দুইজনকে সেখানকার যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করেন। এখানকার প্রতিরক্ষা সাজানো হয়েছে বৃহত্তরভাবে, বাঁ থেকে ডানে বিস্তৃত। এ কোম্পানি এবং বি কোম্পানি বাঁ প্রান্তে। সি কোম্পানি এবং ডি কোম্পানি ডান প্রান্তে। আমাকে বাঁ প্রান্তের দায়িত্ব দেওয়া হলো। অন্যদিকে, মতিনকে দেওয়া হলো ডান

প্রান্তে। আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে এখানে মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনী পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং উভয়পক্ষই একে অন্যকে বিতাড়নের চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো পক্ষই সাফল্য লাভ করতে পারেনি তবে উভয়পক্ষেরই প্রচুর হতাহত হয়েছে। আমরা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার কিছুদিন আগে থেকে এখন পর্যন্ত তুলনামূলক আক্রমণ কম, মাঝেমধ্যে মর্টার কিংবা ফায়ারিং। আমাদের যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই মিত্র বাহিনীর কিছু ঊর্ধ্বতন অফিসার এ এলাকা পরিদর্শনে এলেন এবং সাব সেক্টর কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের কাছে যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিলেন। এরই মধ্যে আমাদের কমান্ডার ইন-চার্জ জেনারেল ওসমানী ৬ নম্বর সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাশারকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। জেনারেল ওসমানী ওই দিন আমাদের সেনাদের মধ্যে বক্তব্য দিলেন এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন।

অমরখানা পাকিস্তানি ঘাঁটি দখল

আমরা অনুধাবন করতে পারলাম অচিরেই খুব বড় কিছু সংঘটিত হতে যাচ্ছে। এরই মধ্যে ক্রমান্বয়ে মিত্র বাহিনীর ট্যাংক, আর্টিলারি ও ইঞ্জিনিয়ারিং রেজিমেন্টে আসা শুরু করেছে এবং ট্যাংক চলাচলের উপযোগী ব্যবস্থা সংস্কার শুরু করে দিয়েছে। এরই মধ্যে আমাদের কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছেন শত্রুর বাংকার, মেশিনগান পোস্ট ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা কোথায় আছে তা শনাক্ত করার জন্য। আমরা কাজে নেমে পড়লাম এবং শিগগিরই শত্রুর অনেক দুর্বল অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হলো। ওই সময়ে একদিন আমাদের কমান্ডার লুঙ্গি পরে এবং মাথায় সাধারণ কৃষকের মতো গামছা পেঁচিয়ে লম্বা একটি গাছের মাথায় উঠে বাইনোকুলার দিয়ে শত্রুর ঘাঁটির বিভিন্ন প্রতিরোধ অবস্থান দেখে একটি ম্যাপ করে ফেললেন। এর মধ্যে আমাদের ব্রিফ করা হলো প্রস্তুত হওয়ার জন্য। চূড়ান্ত আঘাত করার সময় আসন্ন। আমরা ম্যাপ এক্সাইজ, কৌশলগত এক্সাইজ, বালুর মডেল ইত্যাদি সম্পন্ন করলাম কোনো সেনা ছাড়াই। এটা করার কারণ ছিল আমাদের ক্ষয়ক্ষতি যাতে সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে। আধুনিক যুদ্ধের জন্য যার প্রয়োজন খুবই বেশি, তা হলো আর্টিলারি ফায়ার সাপোর্ট। এই একটি জায়গায় আমরা অত্যন্ত দুর্বল, যা আমাদের ছিল না। এ অবস্থায় মিত্র বাহিনীর কাছে আমরা অনুরোধ রাখলাম আর্টিলারি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। মিত্র বাহিনী আর্টিলারি সাপোর্ট দিতে রাজি হলো। এটা শুনে আমাদের মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হলো।

তখন রমজান মাস। যুদ্ধের সব প্রস্তুতি আমরা চূড়ান্ত করেছি। ২০ নভেম্বর, ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপিত হলো। ওই দিনই সন্ধ্যায় দীর্ঘ অপেক্ষার পর আমাদের আক্রমণে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা হলো। আমাদের সব ব্যাটালিয়নের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। মধ্যরাতে আমরা আমাদের ঘাঁটি পরিত্যাগ করে সম্মুখে শত্রুর ঘাঁটির দিকে রওনা হলাম। যখন আমাদের সব সেনা ও কমান্ডার যার যার

ইউনিটের সঙ্গে আক্রমণাত্মক পজিশনে প্রস্তুত হলো, সঙ্গে সঙ্গে মিত্র বাহিনীর আর্টিলারি ফায়ার যেন শত্রুর অবস্থানকে নরকে পরিণত করল। অমরখানা ঘাঁটি আর্টিলারি সেলের আঘাতে মনে হলো যেন মুহুর্মুহু বজ্রপাত হচ্ছে। আর্টিলারি ফায়ার বন্ধ হওয়ার পরপরই আমরা 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে শত্রুর অবস্থান লক্ষ্য করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাই। পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিরোধের চেষ্টা করেও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অমরখানা ঘাঁটি পরিত্যাগ করে জগদলের দিকে পালিয়ে গেল। এই ঘাঁটি দখল করতে গিয়ে আমাদের পক্ষের অনেক হতাহত হয়। ভোরের প্রথম আলোয় অমরখানা দীর্ঘ অপেক্ষার পর দখল হলো। অমরখানা ঘাঁটি জগদল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল পঞ্চগড় যাওয়ার পথে। আমাদের ভজনপুর সাব সেক্টরের মিলিটারি ফোর্স ও চৌলহাটি বিওপির মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য ছিল এই ঘাঁটি দখল করা। অবশেষে অমরখানা আমাদের দখলে এল। অমরখানা এই শক্ত ঘাঁটি পাকিস্তানিদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর মূলত খানসামা ব্যতীত কোথাও পাকিস্তানি সেনারা তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

জগদলহাটের যুদ্ধ

অমরখানা ঘাঁটি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনারা জগদল হাটে গিয়ে দ্রুত প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ইতোমধ্যে পঞ্চগড় থেকে আরও সেনা এনে জগদল হাটে জড়ো করে। তারা আর্টিলারি ফায়ারের সহযোগিতাও নেয়। কিন্তু মুক্তিবাহিনী আর্টিলারি ফায়ার ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাস্ত্রের আক্রমণ উপেক্ষা করে ক্রমাগত জগদলের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ২৩ নভেম্বর আমরা সন্ধ্যা নাগাদ জগদল হাটের উপকণ্ঠে উপস্থিত হই এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা গড়ে তুলি। অমরখানা যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এটা ঠিক করা হয় চৌলহাটি মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প থেকে লোকবল নিয়ে আসা। চৌলহাটি ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহবুব আলম। গেরিলা কমান্ডার হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতা, দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে সে শত্রু এলাকার ভেতরে থেকে কাজ করেছে। তার গেরিলা গ্রুপের তৎপরতায় এ অঞ্চলের রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধীরা তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। মাহবুবদের গেরিলা গ্রুপ একবার অমরখানা ঘাঁটিতেও আক্রমণ চালিয়েছিল, যাতে পাকিস্তানি সেনারা নির্ভীকভাবে চলাফেরা করতে ভয় পায়, ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে।

ওই রাতেই মাহবুবদের গেরিলা গ্রুপ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। পাকিস্তানিরা জগদলহাটে আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থানে মুহুর্মুহু আর্টিলারি ফায়ার, মর্টার ও মেশিনগানের অবিরত গুলি করতে থাকে। আমাদের বাঁ দিকের অবস্থান ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, প্রচুর হতাহত হয়। এমন অবস্থায় মাহবুব তার গেরিলা দল নিয়ে আমার কমান্ডে রিপোর্ট করে। যথাসম্ভব আমি তাকে দ্রুত ব্রিফ করে ডিফেন্স

লাইনে চলে যেতে বলি। আমাদের ডিফেন্স লাইনে দ্রুত খোলা ট্রেঞ্চ, মাথার উপর দিয়ে যাওয়া হাজার হাজার গুলি, মুহুর্মুহু মর্টার শেল বিস্ফোরণ আর গগন বিদারী আর্টিলারির শব্দে সব ফ্রন্ট লাইন প্রকম্পিত। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা এক পাও না পিছিয়ে প্রতিআক্রমণ চালিয়ে গেলাম। যুদ্ধের এই ভয়াবহতার মধ্যেও মাহবুব তার দলের ছেলেদের, যারা সম্মুখযুদ্ধে অভ্যস্ত তাদের মনোবলকে চাঙা রাখার জন্য বাংকার থেকে বাংকারে গিয়ে সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। এভাবে সারা রাত উভয়পক্ষের প্রচণ্ড গোলাগুলির পর ফজরের দিকে পাকিস্তানিদের তরফ থেকে আক্রমণ শিথিল হয়ে আসে। একপর্যায়ে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। সকালের আলো ফুটে ওঠার পর শত্রুপক্ষের আর কোনো তৎপরতা দেখা গেল না। আমরা রেকি টিম পাঠালাম শত্রুর অবস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য। কিছুক্ষণ পরেই যুদ্ধের হুংকার শোনা গেল- 'জয় বাংলা'। খবর এল পাকিস্তানি সেনারা জগদল ছেড়ে পালিয়ে গেছে। ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের নির্দেশে আমরা জগদল অভিমুখে রওনা হলাম এবং জগদল দখল করলাম। জগদলের এই যুদ্ধে আমাদের অনেক হতাহত হয়েছে এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেছে হাবিলদার সাকিম উদ্দিন। তাঁর বীরত্বের জন্য সরকার পরে তাকে 'বীর বিক্রম' উপাধি দেয়। জানাজার পর জগদলেই এই বীর বিক্রমকে সমাহিত করা হয়। জগদল থেকে পালিয়ে পাকিস্তানি সেনারা তাদের পরবর্তী শক্ত ঘাঁটি পঞ্চগড়ে আশ্রয় নেয়।

ন্যায় অধিকার আদায়ের জন্য যুদ্ধ করি

১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর দেশের অন্যান্য স্থানের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। শিক্ষক, ছাত্র, প্রশাসনিক কর্মচারী ও সাধারণ জনতা 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করল। (তৎকালীন পরিস্থিতি আশা-ভরসায় পরিপূর্ণ ছিল, যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণে, যেখানে জাতীয় পরিষদের ঢাকার অধিবেশন স্থগিত করায়।)

তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিষয়ে পড়াশোনা করছিলাম। থাকতাম আলাওল হলে। মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। দেশের অন্য সবার মতো আমিও হতাশ হয়ে পড়ি। একজন বিবেকবান বাঙালি হয়ে আমিও দুই পাকিস্তানের বৈষম্যের সাক্ষী ছিলাম। আমাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন, তখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়ার কথা ছিল এবং আমরা ন্যায্য অধিকারের জন্য সমর্থন করি। এরই মধ্যে পাকিস্তানিরা গোপন সভায় মিলিত হয় তৎকালীন অশান্ত পরিবেশ শান্ত করার জন্য। এছাড়া তারা কালক্ষেপণ করছিল, তাদের সেনা-শক্তি বাড়াতে, যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ জনতার ন্যায্য অধিকারের দাবি দমন করতে পারে। তারা গভর্নর এস.এম এহসানকে পরিবর্তন

করে বেলুচিস্তানের কসাই হিসাবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে ক্ষমতায় আনলেন সাধারণ মানুষের ওপর বর্বর হামলা চালানোর জন্য।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে আমি চট্টগ্রামের চকবাজারে আমার ভাইয়ের বাসায় ছিলাম। মধ্যরাতের দিকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকা থেকে আসা গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমাদের। সকালে আমরা গোলাগুলির কারণ জানার চেষ্টা করি। জানা গেল, ক্যান্টনমেন্ট এলাকার পাকিস্তানি সেনারা ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে হামলা চালায় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে আয়ত্তে রাখার জন্য বাঙালি অফিসার ও সেনাদের হত্যা করে। ষোলশহর দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা লক্ষ করলাম, ক্যান্টনমেন্ট এলাকা রেলওয়ে ওয়াগন দিয়ে ঘেরা হয়েছে, যাতে পাকিস্তানি সেনারা সহজে ঢুকতে না পারে। আমরা কিছু বাঙালি সেনা এবং ইপিআর দেখলাম, যারা ক্যান্টনমেন্ট দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, বাঙালি সেনারা ৮ নম্বর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে অবস্থান করছে। বাঙালি জনতার হত্যার খবর শুনে তারা বিদ্রোহ করে। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই এবং তাদের সাহায্য করতে চাইলাম। ১৯৬৪ সালে যখন চট্টগ্রাম কলেজে পড়ি তখন ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং ক্রপস (ইউওটিসি)-এর মেম্বার ছিলাম। সেখানে আমরা পিটি, ড্রিল, মাইনর ট্যাকটিস এবং ক্যাথারিংয়ের জন্য ট্রেনিং নিতাম। আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে মাতৃভূমির সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণ করব।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আমাদের সুযোগ বাস্তবে পরিণত হলো, যখন আমরা চট্টগ্রাম রেডিওতে মেজর জিয়ার বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের ঘোষণা এবং পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার ঘোষণা শুনলাম। পরবর্তী সময়ে রেডিওতে আরেকটি ঘোষণায় ভলান্টিয়ারদের পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ আমি কালুরঘাটের ৮ ইস্ট বেঙ্গলে যোগ দিই। তখন এখানকার ব্যাটালিয়ন রেল-কাম-রোড ব্রিজ পাহারা দিচ্ছিল। আমি বি কোম্পানির ক্যাপ্টেন চৌধুরী খালেকুজ্জামানের অধীনে ছিলাম এবং ১০ রাউন্ড অ্যামুনিশনসহ ইউওটিসি এর একটি ক্যাডেট রাইফেল আমার জন্য ইস্যু করা হয়। এ সময় আমরা পাকিস্তানি ব্যাটালিয়নশিপের নজরদারিতে ছিলাম। ১১ এপ্রিল পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর আক্রমণ এবং শহরের শেষ প্রান্তের ব্রিজ দখল করে নেয়। এই হামলায় ক্যাপ্টেন হারুন আহমেদ চৌধুরী আহত হন কিন্তু আমরা তাঁকে উদ্ধার করে ব্রিজের পাটাতনে নিয়ে আসি। এছাড়া লেফটেন্যান্ট শমশের মুবিন চৌধুরীও আহত হন কিন্তু তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তিনি পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েছিলেন এবং তারা তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন হারুন তখন সৌভাগ্যবান ছিলেন যে যথাযথ চিকিৎসা সেবা তাকে সুস্থ করে তোলে। শহরের শেষ প্রান্তের ব্রিজ দখল থাকায় পাকিস্তানিরা সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল এবং তারা

আর্টিলারি এবং মর্টার ফায়ার শুরু করল আমাদের জনতার ওপর। প্রয়োজনীয় উপযুক্ত প্রতিরোধ-ব্যবস্থার অভাবে আমাদের অনেক সেনা আহত এবং নিহত হলো। তখন ওই অবস্থান পরিবর্তন করে আমরা রাঙামাটি গেলাম। এটা উল্লেখ করা ভালো, তখন আমি কালুরঘাট ৮ বেঙ্গলের সেনাবাহিনীতে যোগ দিই, যা মেজর মীর শওকত আলীর কমান্ডে ছিল। মেজর জিয়া তখন রামগড়ে ইন্ডিয়ার সঙ্গে অস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য চুক্তি করছিলেন।

১৯৭১ সালের ১২/১৩ এপ্রিল আমরা কালুরঘাট ত্যাগ করি। আমরা বান্দরবান, চন্দ্রঘোনা কাপ্তাই পাড়ি দিয়ে রাঙামাটি পৌঁছলাম। সেনাবাহিনীর আহত সেনাদের বিশ্রাম এবং সুস্থ হওয়ার জন্য সময় দেওয়া হলো এবং এটা যুদ্ধের সময় ছিল বলে মহালছড়িতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো। এখানেই প্রধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিল এবং আশপাশের এলাকায় নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যাতে করে শত্রুর আনাগোনা আগে থেকেই জানা যায়। একটা ফাঁড়ি বুড়িঘাটে ছিল। ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানিরা এই ফাঁড়িতে হামলা চালায় এবং সাথীদের বাঁচাতে গিয়ে ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ শহীদ হন। পরে তাঁকে সর্বোচ্চ মর্যাদা বীর শ্রেষ্ঠ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানি সেনারা কিছু সময় ধরে একের পর এক হামলা চালাতে লাগল। শত্রুরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে কিন্তু আমাদের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা যথেষ্ট থাকার জন্য তারা কোনো হামলা চালাতে পারেনি। শেষে তারা গোপনে মিজো উপজাতির সাহায্য নেয় ভারতের ভেতর সন্ত্রাসী হামলা চালানোর জন্য। ২৮ এপ্রিল পাকিস্তানি এবং মিজো উপজাতি আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা মহালছড়িতে হামলা চালায়। তারা শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত ছিল এবং জঙ্গল যুদ্ধে পারদর্শী মিজো উপজাতি, যাদের প্রচণ্ড আক্রমণ আমরা মোকাবিলা করতে পারিনি। সেনাদের যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়ার সময় ক্যাপ্টেন আফতাব কাদের গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান। এই ঘটনা আমাদের সেনাদের হতোদ্যম করে। শেষে আমরা ১৯৭১ সালে ২৯ এপ্রিল আমাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে রামগড়ে যাই। ক্যাপ্টেন কাদেরকে রামগড় আনা হয় এবং মসজিদের পাশে কবর দেওয়া হয়। করেরহাট অথবা গুইমারার শত্রুদের থামানোর জন্য রামগড়ে নতুন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। মেজর জিয়া যে রামগড় পোস্ট অফিসকে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিলেন, তিনি ব্যাটালিয়ন কমান্ডের দায়িত্ব নিলেন। ফেনী নদীর তীরে এবং পূর্ব পাকিস্তান এবং ভারতের বর্ডারের পাশে রামগড় অবস্থিত। এই বর্ডারের পাশে ইন্ডিয়ান সাবডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার সার্বভৌম ছিল। আমরা যখন রামগড়ের প্রতিরক্ষা গড়ায় ব্যস্ত ছিলাম তখন ইন্ডিয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আসার জন্য নদীর উপর বাঁশের ব্রিজ তৈরি করা হয়।

মে মাসের ২ তারিখে আমরা শত্রুদের যে আক্রমণ আশা করছিলাম, সেই শত্রুদের অনুপ্রবেশ ১/২ তারিখেই হয়েছিল। রামগড়ের মূল ঘাঁটি শত্রুরা ফেলে

যাওয়ায় এবং যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকায় তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালায়, যেটা আমাদের জন্য ছিল খুবই ক্ষতিকর। পরবর্তী সময়ে আমরা যখন আক্রমণে বাধা দিই এবং কিছু কাউন্টার এ্যাটাক চালাই তখন শত্রুদের কার্যক্রম ধীর হয়ে পড়ে। কিন্তু তাদের কাছে আধুনিক অস্ত্র, গোলাবারুদ, মর্টার এবং ভারী মেশিনগান থাকার কারণে তারা সুবিধা বেশি পাচ্ছিল। যখন অন্ধকার হতে শুরু করল তখন আমরা আমাদের অবস্থান বদলানোর সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বর্ডার ক্রস করলাম। দুঃখভরা হৃদয়ে আমরা আমাদের মাতৃভূমিকে বিদায় জানালাম এবং বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার প্রতিজ্ঞা করলাম। আমরা হরিণাতে আমাদের ক্যাম্প করলাম, যা পাহাড়ি রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে ছিল। সেখানে জরুরি ভিত্তিতে আমাদের প্রশিক্ষণ পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমরা ইয়ুথ ক্যাম্প তৈরি করলাম এবং দীর্ঘসময়ের এফ এফ এবং স্বল্প সময়ের এফ এফ ট্রেনিং শুরু করলাম। এরই মধ্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার ক্যাডেটদের আর্মি অফিসার করার সিদ্ধান্ত নিলো। আমি আবেদন করলাম এবং ট্রেনিংয়ের জন্য নির্বাচিত হলাম। ১৯৭১ সালের ২৭ জুন, বাংলাদেশ যুদ্ধ প্রশিক্ষণ জলপাইগুড়ি জেলার মূর্তি টি গার্ডেনে শুরু হয়। বাংলাদেশের ১১টি সেক্টরের জন্য আমরা ৬১ জন ক্যাডেট নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের ট্রেনিংয়ে মাইনর ট্যাকটিস, গেরিলা ওয়ার ফেয়ার, এক্সপ্লোসিভ এবং আর্মস হ্যান্ডেলিং অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের ট্রেনিং ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ছিল। অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলামের পর্যালোচনায় প্যারেড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ ফোর্সের সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে নিযুক্ত হই। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং চিফ কমান্ডার আতাউল গণি ওসমানীও উপস্থিত ছিলেন। আমি ৬ নম্বর সেক্টরে পোস্টেড হই এবং তেঁতুলিয়া থানার সাব সেক্টর ভজনপুরের প্রতিরক্ষা কাজে যোগ দিই।

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, বীর প্রতীক

জন্ম ৩১ মে ১৯৪৭, ভোলা। শিক্ষা এসএসসি (১৯৬৩), কাজেম আলী হাই স্কুল, এইচএসসি (১৯৬৫), চিটাগাং কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স (১৯৭০)। ন্যাশনাল সিকিউরিটি এ্যান্ড স্ট্রাটেজি বিষয়ে আমেরিকার ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি (ওয়াশিংটন ডিসি) ১৯৯৫ সালে ডিগ্রি লাভ করেন।

সেনাবাহিনীতে যোগ দেন জুন, একাত্তরে। ৯ অক্টোবর কমিশন লাভ করে নিয়োগ দান ৬ নম্বরের তেঁতুলিয়া সাব-সেক্টরে। তার অন্যতম অংশগ্রহণের যুদ্ধ-অমরখানা, পঞ্চগড়, বাবুরগাঁ, খানশামা প্রভৃতি।

তার অসম সাহসের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।

মাকে ভালোবেসে প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি

ইউ কে চিং, বীরবিক্রম

ছোটবেলায় খুব দুষ্টু ছিলাম। পড়াশোনা করাটা ছিল আমার কাছে বিরক্তিকর বিষয়। কাজের চেয়ে অকাজেই লিপ্ত থাকতে পছন্দ করতাম। আমাকে নিয়ে বাবা-মা বেশ চিন্তা করতেন। একদিন আমার এক ভগ্নিপতি জোর করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তারপর ভর্তি করিয়ে দেন ইপিআরে। পাহাড়ি কিশোর হওয়ার কারণে সমতলের মানুষের সঙ্গে মেশার তেমন কোনো অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই ইপিআরে ভর্তি হওয়ার পর থেকে মনের ভেতরে সর্বদাই ভয় কাজ করতো। ট্রেনিং শুরু হলে এই ভয়টা ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করে। পাহাড়িদের জীবন অনেক কঠিন ও কৌশলময়। তাই ট্রেনিংয়ে কৌশলগুলো ও শরীর গঠন করার পদ্ধতিগুলো আমার কাছে মজার কোনো খেলার মতোই মনে হতো। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতাম।

১৯৭১ সালে আমি রংপুরের হাতিবান্ধায় ইপিআরের বর্ডার আউটপোস্টে নায়েক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। যুদ্ধ শুরু হলে আমাকে হাবিলদার পদে উন্নীত করা হয়। আমার অধীনে ৬৫ জন সৈনিক ছিল। আমি তাদের নিয়ে রংপুর, লালমনিরহাট, পাখিউড়া, কাউয়াহাগা, বাঘবান্ধা, হাতিবান্ধা, চৌধুরীহাট, ভুরুঙ্গমারী, কুলাঘাট প্রভৃতি অপারেশনে অংশ নিই।

কাউয়াহাগার অপারেশন

যুদ্ধ দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে কিছুদিন হলো। লালমনিরহাট নদীর ওপারে আমরা একদিন দেখতে পেলাম আগুন জ্বলছে। আমার সঙ্গে গার্ড হিসেবে ছিল দুজন সিপাহি। ওদের বললাম, কোনো ফায়ার-টায়ার করার দরকার নেই, শুধু দেখতে থাকো। এর আগে অবশ্য আমরা ওখানে এমবুশ করেছিলাম। একসময় দেখলাম, দুজন পাকিস্তানি প্যান্ট-শার্ট ক্লোজ করে শাড়ি পরে ঘরে ঢুকছে। ভাবলাম, যদি গুলি করি তাহলে হয়তো মারা যাবে, নয়তো পালিয়ে যাবে। কিন্তু ওদের জীবিত ধরতে হবে নয়তো জানা যাবে না মূল ঘটনাটা। তাই ওদের দুজনকে জীবিত ধরে

আনার জন্য চারজনকে পাঠালাম। বলে দিলাম, যদি ঘরে দুটি দরজা থাকে তাহলে দুই দরজায় দুজন দাঁড়াবে আর দুজন ঘরে ঢুকবে। যেই কথা সেই কাজ। কিন্তু একজন তবুও পালিয়ে গেল আর একজন জীবিত ধরা পড়ল। সে ছিল একজন পাঞ্জাবি সেনা। সেনাটিকে ধরে এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো—কী জন্য ছদ্মবেশ ধরেছে, তার দলের নেতা কে? দলের কে কোথায় আছে ইত্যাদি। সে সবই বলে দিয়েছিল। কারণ, তাকে বলা হয়েছিল যে সে বাঁচতে চায়, নাকি মরতে চায়। যদি বাঁচতে চায় তাহলে আমাদের সব কথা শুনতে হবে, আর মরতে চাইলে এখনই তাকে বেয়োনেট চার্জ করা হবে। তাই সে বাঁচার জন্য সবই বলে দিয়েছিল।

সারা রাত আগুন জ্বলল নদীর ওপারের গ্রামটায়। তবুও আমরা রাতে কোনো ফায়ার ওপেন করলাম না। কারণ, জানতে পেরেছিলাম পাকিস্তানিদের কেউই আর ওখানে নেই। তাই আমি রাতে সেনাটাকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। অবশ্য ওকে বাঁচিয়ে রাখার বিরুদ্ধে আমার দলের অনেক সেনা আপত্তি তুলেছিল। আমি তখন ঠাণ্ডা মাথায় তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম- ওকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে আমাদের স্বার্থেই। তাছাড়া পাকিস্তানিদের হাতে আমাদের দেশের অনেক মানুষ বন্দি হয়ে আছে। এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও ওদের জেলে বন্দি। ওকে আমরা তখনই ফিরিয়ে দেব যখন ওরা আমাদের ক্যাম্পে ২০-২৫ জনকে ফিরিয়ে দেবে। তাই রাতেই আমি পাঞ্জাবি সেনাটিকে ভারতীয় ফোর্সের কাছে হ্যান্ডওভার করে আসি। ওকে পৌঁছে দিয়ে এসে আমি আমার দুজন সেনা নিয়ে আবার নদীর ঘাটে গেলাম। কান পেতে শুনলাম, মহিলা ও বাচ্চাদের কান্না শোনা যাচ্ছে। সিপাহিরাও শুনল। সারা গ্রাম তো পুড়ে ছাই, বাচ্চারা এল কীভাবে? তাড়াতাড়ি করে মাঝিকে খুঁজে বের করে এনে বললাম, নদীর ওপারে গিয়ে তোমাকে জানতে হবে কারা ওখানে কাঁদছে, কেনই বা কাঁদছে। মাঝি তো ভয়ে অস্থির। কারণ, ওখানে পাকিস্তানিরা থাকতে পারে। যা-ই হোক, তাকে অভয় দিয়ে পাঠালাম নদীর ওপারে। ফিরে এসে সে বলল, স্যার ওপারে কোনো পাকিস্তানি নেই, অনেক মহিলা আর বাচ্চা বালুর মধ্যে গর্ত করে বসে বসে কাঁদছে। তাকে বললাম, যে করেই হোক ওদের এপারে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। মাঝিকে বললাম, তুমি গিয়ে বলো যে মুক্তিফৌজের হাবিলদার সাহেব আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছেন। এভাবে ছয়টি পে দিয়ে ৩২ জন মহিলা আর তাদের সন্তানদের নদী পার করে এনে গ্রামের স্কুলে নিয়ে ওঠালাম। গ্রামের মাতব্বর, স্কুলের শিক্ষকদের ডেকে সব বাড়ি থেকে কাঁথা, শাড়ি, চাল, ডাল তুলে ওদের সবকিছুর ব্যবস্থা করলাম। এরপর ওদের সবার নাম রেজিস্ট্রি করে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে এসে আবার নদীর ওপারে গেলাম আমার দল নিয়ে। তার আগে অবশ্য নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে ওখানে কোনো পাকিস্তানি নেই। গিয়ে দেখি

কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব নেই সেখানে। কেবলি আগুনে পুড়ে যাওয়া কালো কালো ছাইয়ের স্তূপ। এর মধ্যে আমাদের দেখে কচুক্ষেতের মাঝ থেকে একজন বুড়ো আর একটি বাচ্চা বেরিয়ে এল। ওরা দুজন গোপনে লুকিয়ে ছিল। তাদের কাছ থেকে শুনলাম, যত বাঙালি পুরুষ ছিল, সবাইকে ব্রাশফায়ার করে মেরে ঘরের চাল তাদের ওপরে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি সেনারা। ওদের কথামতো টিনগুলো উঁচু করে দেখি সেই বীভৎস দৃশ্য। কাউকে চেনার উপায় নেই, কেবলি পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়া মাংসের কালো স্তূপ। ওই অবস্থায়ই গর্ত করে তাতে দুজন দুজন করে সমাহিত করে আমরা আমাদের ব্যারাকে ফিরে আসি। আমার স্মরণে এটা ছিল এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ।

নৃশংসতা

অসংখ্য অঘটনের জন্ম দিয়েছে ওই বেজন্মা পাকিস্তানিরা। আমার আরও মনে পড়ছে যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকে আমি তখন রংপুরে অবস্থানরত। একদিন সকালবেলা। কয়েকজন সিপাহি নিয়ে গেলাম শহরের পাশে। সেখানে ছিল একটা ছোট ব্রিজ। দেখলাম ব্রিজের নিচে অনেক চাটাই স্তূপ করা। সঙ্গীদের নিয়ে একে একে সাতটি চাটাই তুললাম। চাটাই তুলে যা দেখলাম তা বলতে আজও আমি শিহরিত হই। সেই বীভৎস দৃশ্য ভোলার নয়—প্রতিটি চাটাই এর নিচে রক্তে ভেজা ক্ষতবিক্ষত মানুষের লাশ। সব লাশই ছিল মেয়েদের। হাতে ঘড়ি, পায়ে জুতা দেখে বুঝলাম স্কুল-কলেজের ছাত্রী। চেহারা দেখে চেনার কোনো উপায়ই ছিল না। কারণ, সবারই মুখের আর বুকের মাংস খুবলে নিয়েছে পাকিস্তানি শয়তানের বাচ্চারা। পার্শ্ববর্তী আরেকটি ব্রিজের নীচে দেখলাম কচুরিপনাগুলো কেমন যেন এলোমেলো। সন্দেহ হলে সেনাদের বললাম কচুরিপনাগুলো তুলে দেখতে। সেই একই দৃশ্যের অবতারণা হলো—বাঙালি নারীদের বীভৎস মৃতদেহ। কারোরই শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো আস্ত নেই। খুবলে খেয়েছে হানাদাররা। মেয়েদের লাশগুলো তুলে এনে সারা শহরে মাইকিং করলাম যে এরকম মেয়ে কারও আছে কি না বা ছিল কি না। কেউই সাড়া দিল না, তাই রংপুর টাউন হলের পাশে ওদের একত্রে দাফন করি। এর কয়েকদিন পর আবার হাঁটতে হাঁটতে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার সময় একদিন দেখলাম কাঁচা মাটির তৈরি হালকা উঁচু ঢিবি। কেমন যেন সন্দেহ হলো আমার। সিপাহিদের বললাম, মাটির ওপর ঘা দিয়ে দেখতে। ওরা ঘা দিয়ে দেখল নরম নরম লাগে। মাটি খুঁড়তে বললাম ওদের। দেখতে পেলাম দুটি করে লাশ একেকটি গর্তে হাত-পা বাঁধা। এ রকম তিন-চারটি গর্ত খুঁড়লাম—একই অবস্থা। লাশগুলোর চেহারা দেখে বুঝলাম তারা উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। আর না খুঁড়ে সেনাদের বললাম, পুনরায় মাটি চাপা দিয়ে রাখতে, অনর্থক মৃত ব্যক্তিদের কষ্ট দিলে পাপ হবে। এছাড়া

দিনাজপুর এলাকায় দেখেছিলাম বিহারিদের অকথ্য নৃশংসতা। ওরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে নিয়ে পানির মধ্যে চুবিয়ে মারত। প্রথমে গলার ওপরে পা দিয়ে পানির মধ্যে চেপে ধরে রাখত। তখন বাচ্চাগুলোর আর ছোট ছোট শরীর নড়াচড়া করত না, ঠিক তখনই ছেড়ে দিত। অর্থাৎ মরে যাওয়ার পর ছেড়ে দিত পানির মধ্যে। এভাবে অসংখ্য শিশুকে মেরেছে বিহারিরা। এই বিহারিরাই আবার কোথাও নদীর ধারে নারীদের লম্বা লাইন করে দাঁড় করিয়ে ইচ্ছেমতো বেঘোরে পেটাত। যখন মহিলারা অজ্ঞান হয়ে যেত বা মারা যেত তখন ধাক্কা মেরে নদীতে ফেলে দিত। এমনি করে নৃশংসভাবে অসংখ্য মহিলাকে খুন করেছে বিহারিরা।

সহযোদ্ধা হারানোর বেদনা

যুদ্ধ যখন চলে তখন সহযোদ্ধাদের সবার প্রাণ এক প্রাণে পরিণত হয়। তাই সে সময়ে হারানো কোনো বন্ধুর কথা মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। আমিও পারিনি। বাঘবান্ধায় অবস্থানকালে আমার ডিফেন্সে দুজন আনসার ছিলেন—আপন দুই ভাই। যুদ্ধের মাঝখানেই বড় ভাই এক ডেলিভারি কেস থাকায় বাড়িতে যায়। বাড়ি থেকে ফেরার সময় সে খাওয়ার জন্য একটি মুরগি নিয়ে আসে। বহুদিন পর বাড়ির সবাইকে দেখতে পেয়ে সে তখন খুব উৎফুল্ল। মুরগিটি জবাই করার জন্য বাংকারের সামনে যায় ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে। ওদিকে পাকিস্তানিরা অদূরেই তাদের ক্যাম্প থেকে সব সময় আমাদের বাংকারে দৃষ্টি রাখত। আমি বুঝতে পেরে ওদের দুই ভাইকে বকাঝকা করে বাংকারে ঢুকতে বললাম। ঠিক তখনই বোমা নিক্ষেপ করে পাকিস্তানি বাহিনী। প্রথম বোমাটি পড়ল ওদের ২৫ গজ ডানে, দ্বিতীয়টি ২৫ গজ বামে। এই অবস্থা দেখে ওরা ভয় পেয়ে বাংকারের মুখের দিকে দৌড় দিল। তৃতীয় বোমাটি পড়ল ঠিক বাংকারের মুখ বরাবর। ঘটনাস্থলেই দুই ভাই শহীদ হন সেদিন। আমি খুবই কষ্ট পেয়েছিলাম সেই সহোদরদের মৃত্যুতে। এরপর ভুরুঙ্গমারীতে হারিয়েছিলাম একজন সৈনিক। এক পাকিস্তানিকে সে নিজ হাতে মেরে খুশিমনে লাশ আনতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেও লাশ হয়ে ফিরে এসেছিল।

তবে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম চৌধুরীহাট অপারেশনের সময়। সেই অপারেশনে আমাদের সঙ্গে এক লেফটেন্যান্ট ছিলেন। খুবই সুদর্শন, বিএ পাস একজন যুবক। বুদ্ধিমত্তা ও নৈপুণ্যের কারণে ভারত থেকে তাঁকে এই উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তো রাতের বেলা আমরা পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানি ঘাঁটিতে এ্যাটাক করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দিলেন ডান দিক আর নিজে নিলেন বাম দিক। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, বাম দিকে কয়েক গজ এগোতে না এগোতেই একটি বোমা এসে পড়ে তার ওপর, সঙ্গে সঙ্গে মারা যান তিনি। কতটা কষ্ট যে সেদিন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছিল সেই রাতের আঁধারে, তা আর বলে

বোঝানো যাবে না। তাঁর নাম ছিল আব্দুস সামাদ (আবু মঈন আশফাকুস সামাদ, বীরউত্তম)। ভুরুঙ্গমারী বাজারের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়েছিল। আজও সেই অঞ্চলে সামাদনগর নামে একটি এলাকার পরিচিতি রয়েছে। লেফটেন্যান্ট সামাদ সাহেব আজও বেঁচে আছেন ওই এলাকার মানুষের মুখে মুখে।

অপ্রীতিকর ঘটনা

মনে পড়ছে, আমি আমার দল নিয়ে তখন অবস্থান করছি কুলাঘাটে। অতি সতর্কতার সঙ্গে সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে নিচ্ছি। অন্যদিকে নিকটবর্তী পাকিস্তানি টিম উপর্যুপরি গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। দিনের বেলা ভারতীয় ফৌজ এল। জিজ্ঞাসা করল, হালচাল কী, ওদের অবস্থান এখান থেকে কত দূরে... ইত্যাদি। আমি তাদের অভয় দিয়ে বললাম, শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা আমাদের মতো নিরাপদ দূরত্বে আছি এবং আরও গুছিয়ে নিচ্ছি। সকাল তখন ১০-১১টা হবে। মেশিনগান বসালাম একটি গাছের ওপর। ব্রাশ মারলাম পর পর কয়েকটা। দেখলাম সব নিশ্চুপ, সাড়াশব্দ নেই। সেদিন সারা দিন আমরা বাংকারে অবস্থান নিয়ে থাকলাম। রাত ৯টার দিকে ওরা প্রথমে ফায়ার ওপেন করল, এরপর শুরু করল বোম্বিং। এই অবস্থায় আমি সেনাদের প্রস্তুত হতে বলার জন্য বাংকারে যাই। গিয়ে দেখি বাংকারে কেউ নেই, সবাই হেডকোয়ার্টারে চলে গেছে। সারা রাত একাই ওদের রেস্পন্স করে সকালে গেলাম হেডকোয়ার্টারে। দেখলাম, সবাই খোশগল্পে মেতে চা-নাশতা খাচ্ছে। রাগে-ক্ষোভে তখন আমার সারা শরীর কাঁপছে। রাগের মাথায় কয়েকজনকে লাথি মেরে জিজ্ঞাসা করলাম, যুদ্ধ করতে এসেছ, নাকি পেট পুরতেই এসেছ? আমাকে একা বাংকারে ফেলে রেখে তোমরা কীভাবে আসতে পারলে? যুদ্ধের ময়দানে এত ভয় পেলে চলবে কী করে? আমি তো মরিনি, এখনো বেঁচে আছি। এক সিলেটি হাবিলদার ছিলেন আমার দলে। দেখি তিনি রিসিভার হাতে নিয়ে আরামে চা খাচ্ছেন। টেলিফোনের রিসিভারটা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে বললাম, যত দিন এখানে আছেন ততদিন আপনি আর রিসিভার ধরবেন না, সেই যোগ্যতা আপনি আজ থেকে হারিয়ে ফেলেছেন।

আমি তখন রিসিভারটা নিয়ে ভারতে কল করলাম। ধরলেন এক মেজর। তাঁর বাড়ি ছিল পাবনায়, এক হিন্দু অফিসার। সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে কমান্ডার সাহেব, আমি এখনই গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনারা সবাই হাতিয়ার রেখে গাড়িতে উঠে চলে আসেন। মেজর সাহেবের কথামতো গাড়ি এলে আমরা সবাই বেডিংসহ গাড়িতে উঠে ভারতে চলে গেলাম। গিয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম, সেখানে একটি অফিস ও একটি ক্যান্টিন আছে, আর আছে একটি বিশালাকার গোডাউন। প্রথমে ভেবেছিলাম, খাবারের গোডাউন হবে। কিন্তু না, পুরোগুদাম ভর্তি হাতিয়ার। রাশিয়ান অস্ত্র। মেজর সাহেবের নির্দেশমতো

সবাই যে যার ইচ্ছামতো হাতিয়ার নিয়ে আমরা চলে এলাম ভুরুঙ্গমারী ও বাঘবান্ধার মাঝামাঝি একটি জায়গায়। সেখানে ডিফেন্স নিয়ে আমরা পাকা রোডের ওপর দুটি এলএমজি বসালাম। বাংকার বানালাম গাছের আড়ালে। সেখানে খাট পাতা, খাটের ওপর মশারি ও হারিকেন। বাংকার থেকে ৫০ গজ দূরে রোডব্লক দিলাম যাতে পাকিস্তানিরা গাড়ি নিয়ে এলে রাস্তা ক্রস করতে না পারে। পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পের পাকিস্তানিদের দুটি আর্টিলারি ছিল। রাতে খুব আর্টিলারি মারল। ওদের অটোমেটিক ভালো ছিল— বোমাগুলো সব আশপাশে পড়ত। আমি আমার সেনাদের বললাম, ফায়ার ওপেন করার দরকার নেই। ওরা যদি সামনাসামনি আসে তবেই আমরা যুদ্ধ করব। তবুও তোমরা সব সময় প্রস্তুত থাকবে। সেই রাতে পাকিস্তানিরা আমাদের একটানা খুব ফায়ার করল। আমরা চুপচাপ রাত কাটিয়ে দিলাম। সকালবেলা ভারতীয় ফৌজ নিয়ে মেজর সাহেব এলেন। পাকিস্তানি সেনাদের অবস্থান জানতে চাইলে বললাম ভুরুঙ্গমারী বাজারের পাশে আছে ওরা। মেজর ওদের দেখতে চাইলে তাঁকে নিয়ে একটি ঢালু জায়গা থেকে বাইনোকুলার দিয়ে দেখলাম পাকিস্তানিদের। সকালবেলা ওদের চা-নাশতা খাওয়াচ্ছে এক বাঙালি মহিলা। দেখে-শুনে মেজর বললেন, যে করেই হোক ওদের খতম করতে হবে। এরপর তিনি আমাদের বাংকার দেখতে গেলেন। বাংকার দেখে খুব উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আজ রাতেই শুরু হবে আখেরি অপারেশন। তোমরা ততক্ষণ নিশ্চিন্তে বসে থাকো। রাতের বেলা আমরা ১০-১২টা তিন ইঞ্চি মর্টার, ১০-১২টা চার ইঞ্চি মর্টার আর, আর মেশিনগান নিয়ে তৈরি হলাম। এরপর সারা রাত ধরে চলল ফায়ারিং, বোম্বিং। সকালে এলেন জেনারেল অরোরা। আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বললেন, শুনলাম ভুরুঙ্গমারী অঞ্চল ক্লিয়ার, তাই না? আমারও সে রকম মনে হয়েছিল তাই মাথা নাড়ালাম। রাস্তার ওপর দেওয়া বাঁধটি খুলে দিলাম জেনারেলের গাড়ি যাওয়ার জন্য। যেই উনি বাঁধটি ক্রস করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফায়ারের ওপর ফায়ার। জিপের ওপর দিয়ে, অরোরা সাহেবের মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুটে চলল একের পর এক। ভাগ্য নিতান্তই ভালো যে গাড়ির চাকা এবং ওনার মাথায় কোনো গুলি লাগেনি। তড়িঘড়ি করে জিপ থেকে নেমে এসে জেনারেল বললেন, ইউ কে তোমার সন্দেহই বোধ হয় ঠিক। ওরা এখনো স্ট্রং আছে। এরপর আমরা পাকিস্তানিদের লক্ষ্য করে পর পর ৩০টি বোমা মারলাম। দেখি কোনো সাড়াশব্দ নেই আর। শেষে যখন ওখানে গেলাম, দেখি চারটি লাশ ছাড়া আর কিছু নেই। চারজনই ছিল সেখানে।

আরেকটি অপারেশনের কথা মনে পড়ছে। ওই পাকিস্তানি দলটিরও দুটি আর্টিলারি ছিল। খুবই নিরাপদ স্থানে থেকে আমাদের ফায়ার করত একের পর এক। ভারতীয় ফৌজের মেজর এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ওদের অবস্থান কোথায় ? ওদের অবস্থান জানার পর বললেন, তিন মাইল দূর দিয়ে ঘুরে গিয়ে

ওদের কাউন্টার-এ্যাটাক করতে হবে, সামনাসামনি নয়। তার কথা অনুযায়ী কয়েকজন সাহসী রাজপুত সেনা নিয়ে তিন মাইল ঘুরে ওদের বাংকারের কাছাকাছি গেলাম। রেললাইনের স্লিপারের নিচে গর্ত করে বাংকার বানিয়েছিল ওরা। সেই গর্ত থেকেই ফায়ার ও বোম্বিং করতো। আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়েই রাজপুত সেনারা একেবারে বাংকারের মুখে গিয়ে বলল, হ্যান্ডসআপ। হাতিয়ার দেখে একে একে বেরিয়ে এল সাতজন। একজন কমান্ডার ছয়জন সিপাহি। ওই সাতজনকে আমরা গুলি করে মারিনি। মেরেছিলাম বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে। একটি ইনজেকশনই যথেষ্ট। এভাবে সাতজনকে মেরে রাস্তার ওপর লাইন করে শুইয়ে দিয়েছিলাম আমরা।

গ্রামবাসীর সহযোগিতা

সম্ভবপর সব ধরনের সহযোগিতা করেছেন গ্রামবাসী। কেননা, যুদ্ধের সময় শত্রু ছাড়া বাকি সবাই একে অন্যের মিত্র। আমরা যেমন গ্রামবাসীদের নিরাপত্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছি। গ্রামবাসী আমাদের জন্য তার চেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছে। চাল, ডাল, কাঁথা, কাপড়—সবকিছু দিয়েই পাশে থেকেছে তারা। ভাত না থাকলে ভাতের ফ্যান দিয়েছে, ঘরে চাল না থাকলে গ্রামের সবার থেকে চাল উঠিয়ে আমাদের দিয়েছে। এমনকি গরু, হাঁস, মুরগি, ছাগল এগুলোও দিয়েছে। তবে আমাদের দলটি যেহেতু ইপিআরের সৈনিকদের নিয়ে, ফলে আমরা খাবার-দাবারের ব্যাপারে তেমন চিন্তাভাবনা করতাম না।

স্বপ্ন শুধু স্বাধীনতা

তখন শুধু একটাই স্বপ্ন ছিল— দেশটা কেমন করে আজাদ হবে। স্বাধীন হবে। কেননা, এই দেশকে আমার নিজের দেশই মনে করতাম, করেই যাব আমৃত্যু। এখানেই আমার তিন পুরুষের নাড়ি পোঁতা। তাই দেশ আমাকে যা-ই মনে করুক, আমি নিজেকে এই দেশের বাইরের ভাবতে পারি না। ভালোবাসি এই মাতৃভূমিকে। আর এই ভালোবাসা থেকেই আমি প্রাণ বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি। আমার স্মরণে ১৯৭১-র ভয়াবহ যুদ্ধের উত্তাল সময়গুলোতে কখনোই ভাবতে পারিনি আগামীকাল আমি বেঁচে থাকব। প্রতিটি দিন জীবনের বোনাস টাইম মনে হতো। তাই যত বিপদেই পড়েছি ঘাবড়ে যাইনি, ভয় পাইনি। আমার সেক্টর কমান্ডার আবুল বাশার (বীরবিক্রম) সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইউ কে আপনি কি মনে করেন দেশটা স্বাধীন হবে! জবাবে বলেছিলাম, অস্ত্র যখন হাতে নিয়েছি স্যার যতক্ষণ আমার অস্ত্র ধরে রাখার শক্তি থাকবে আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সাহস আছে তো লড়ে যাওয়ার? বলেছিলাম, আমাকে সাহস দেওয়া-না দেওয়ার ব্যাপার আমার

সৃষ্টিকর্তার। তবে স্যার এখনো আমি কিছুতে সাহস হারাইনি, ভয়ও পাইনি। এভাবেই আমি আমার দেশমাতার মুক্তির স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে গিয়েছি সব ভয়ভীতি বাধাবিপত্তিকে পেছনে ফেলে। কেননা, মুক্তির প্রশ্নে ভীতি কখনো সাফল্য আনতে পারে না। স্বপ্নের মূল্যায়ন করতে হয় সাহস দিয়ে।

বিজয়ী বাংলাদেশ

১৪ ডিসেম্বর থেকে আমি আমার গ্রুপ নিয়ে তিস্তা ব্রিজ এলাকায় অবস্থান করছিলাম। টানা দুই দিন হালকা-পাতলা গোলাগুলি হলো। এরপর ১৬ ডিসেম্বর সকালে হঠাৎ করে আমাদের জানানো হলো নয়টা পর্যন্ত সময়, আর ফায়ার করা যাবে না। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, বিজয় ঘোষিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা সকাল নয়টার আগেই ছোট্ট একটি অপারেশন সারলাম। চারজন পাকিস্তানি একটি বাংকারের সামনে বসে চা খাচ্ছিল। সবকিছু পজিশন করে দিলাম ব্রাশ। চারজনের মধ্যে দুজন মারা গেল আর দুজন পালিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর নয়টা বাজলে আশপাশের পাকিস্তানিরা সাদা পতাকা টানিয়ে দেয়। 'দেশ স্বাধীন হয়েছে'—এই কথাটুকুর তাৎপর্য যে কত ব্যাপক ও বিস্তৃত তখনো আমি বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে পারলাম যখন আমরা তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে রেলস্টেশনে গেলাম। গিয়ে দেখি রেলের স্টাফরা আনন্দে কথা বলতে না পারার মতো সময়ের সন্ধিক্ষণেও গরু-খাসি জবাই করে আমাদের খাবার তৈরি করছে। চারদিকে তখন বিজয়ের সুগন্ধী বাতাস। পৃথিবীর দরিদ্রতম এই দেশটির মানুষের আনন্দের কত ধরনের প্রকাশ যে থাকতে পারে সেদিন দেখেছিলাম।

স্টেশনের খাওয়া সমাপ্ত করে দুটি গরুর গাড়িতে আমাদের সব বেডিং আর অস্ত্র নিয়ে আমি রংপুরে রওনা হলাম, বাকিরা সবাই হেঁটে এল রাত নয়টায় গিয়ে উঠলাম রংপুর কলেজে। সেই রাতেই গ্রামের লোকজন আমাদের অভ্যর্থনা জানায় এবং গরু জবাই করে খেতে দেয়।

স্মরণীয় মুহূর্ত

রাতেই জানতে পাই আত্মসমর্পণকারী পাকিস্তানি সেনারা অনেকে কলেজ গেটে অবস্থান করছে। সকালে সেখানে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেককেই চিনতে পারলাম। কেননা, যুদ্ধের আগে আমরা একসঙ্গে থেকেছি, খেলেছি, খেয়েছি। আমাকে দেখেই তাদের কয়েকজন হাসিমুখে এগিয়ে এল। অনেক দিন পরে ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয়। তেমনিভাবে বলে উঠল, শালা ইউ কে, তুমি এখনো মরোনি দেখছি। জবাবে আমি বললাম, শালা আমি এখনো বেঁচে আছি বলেই তোমাদের জীবিত দেখছি। এভাবে কিছুক্ষণ বাকযুদ্ধ করে হাত মেলায়। ওরা বলল, ভাই তোমাদের দেশ তোমাদেরই থাক। সবকিছু ভুলে যাও,

যা হয়েছে হয়তো বা ভালোই হয়েছে। তোমরা তো যা-ই হোক খেতে পেরেছ। আর আমরা না খেয়ে মরেছি। যা-ই হোক, এসব শেষ হয়েছে ভালো হয়েছে। তোমাদের শুভ হোক। আমিও ওদের কল্যাণ কামনা করে পরস্পর বিদায় নিলাম।

স্বপ্ন দেখি

স্বাধীনতার পর ভেবেছিলাম, দেশটাকে আমরা নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেব। একসঙ্গে গড়ে তুলব আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের অনাবিল সুখ। কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।... আমি মনে করি আমি যে আজও বেঁচে আছি এটা আমার বোনাস লাইফ। শুধু আমি নই, যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসা সব যোদ্ধারই বোধ হয় একই ভাবনা আমার মতো। স্বপ্ন জন্ম দেয় সম্ভাবনা, আর সম্ভাবনা রূপ পায় বাস্তবে। আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা শুধু একটি শব্দ নয়, সব ধরনের বৈষম্য থেকে মুক্তি। নিপীড়ন, অত্যাচার, লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তি। আমরা চেয়েছি, এমন একটি দেশ, যে দেশ তার সব নাগরিককে মর্যাদা দেবে, দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেবে, সুশাসন কায়েম করবে, আইনকানুন প্রণয়ন করবে, যার পরিণত রূপ হবে সুখী সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ। সেই ভাবনার সঙ্গে বাস্তবতার অনেক অমিল। তারপরও স্বপ্ন দেখি একদিন আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

ইউ কে চিং, বীর বিক্রম

জন্ম : ৫ মে, ১৯৩২, বান্দরবান। তিনি ১৯৫২ সালে তদানীন্তন ইপিআর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস) এ যোগদান করেন এবং নায়েব সুবাদার পদে ১৯৮২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। একাত্তরে রংপুরে অবস্থিত ১০ উইং ইপিআর এর অধীন হাতিবান্ধা বিওপিতেও কর্মরত ছিলেন। ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব-সেক্টরের নাগেশ্বরী সীমান্তবর্তী *চৌধুরীহাটে শত্রু* অবস্থান দখলে *বীরত্বের সাথে লড়াই করেন*। যুদ্ধের সীমানা তার বিস্তৃত- নাগেশ্বরী, রৌমারী, হাতিবান্ধা, পাখিউড়া, ভুরুঙ্গামারী ইত্যাদি।
মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য সাহসী ভূমিকার জন্য তাকে সরকার 'বীর বিক্রম' বীরত্ব উপাধি প্রদান করেন। ইউ কে চিং একমাত্র উপজাতি খেতাবপ্রাপ্ত বীর।

মেজর খালেদ মোশাররফ
অনন্য আদেশ, দুঃসাধ্য কাজ

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

প্রচণ্ড ভালোবাসা, অগাধ বিশ্বাস আর অফুরান স্নেহ অবজ্ঞা করা বর্ণনাহীন কষ্টের। সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ কিছু অনুরোধ করলেন আমাকে। এগুলো হওয়ার কথা ছিল আদেশ এবং মেজর খালেদের আদেশ যে কী জিনিস তা তার অধীনস্থরা খুব ভালো করেই জানেন। আমি তার তুলনায় শুধু নয়, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবেও একটা পিঁপড়া। আমাকে তাহলে অনুরোধ কেন? সে প্রসঙ্গেই আসছি।

নতুন ছেলে, অস্ত্র আর গোলাবারুদ আনতে সেপ্টেম্বর মাসে গিয়েছিলাম সেক্টর সদর দপ্তর মেলাঘরে। দেশের ভিতর প্রবেশ করার (Induction) প্রক্রিয়া শেষ হয় মেজর খালেদ মোশাররফ বা ক্যাপ্টেন হায়দারের ব্রিফিং এর মাধ্যমে। ব্রিফিং শেষে মেজর খালেদ আমাকে ডাকলেন। বললেন, দেখোতো কিছু টেলিফোন সেট, টাইপ রাইটার আর সাইক্লোস্টাইল মেশিন (এখনকার ফটোকপিয়ারের মতো বহু পুরাতন ঢং এর মেশিন। (স্টেনসিল পেপারে টাইপ করে হাতে ঘুরিয়ে একাধিক কপি ছাপানো বের করা যেতো) আনতে পারো কিনা। আমার সেক্টর কমান্ডার ভালো করেই জানেন কুমিল্লা জেলার যে এলাকায় (মুরাদনগর, কোম্পানিগঞ্জ, নবীনগর) আমরা যুদ্ধ করি এবং যেসব এলাকায় যুদ্ধের দায়িত্ব তিনি আমাকে দিয়েছেন সেসব জায়গায় তার চাহিদা পূরণের সামগ্রীসমূহ নেই। অর্থাৎ সরকারি অফিস আদালত নেই বা থাকলেও সেগুলো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত। সেনাবাহিনীতে 'না' বলে কিছু নেই। আমি অ্যাটেনশন হয়ে সব জেনেশুনেও জবাব দিলাম, 'জি স্যার'। উনিও যে জানেন না তা নয় তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আর টাকাপয়সার অবস্থা তো দেখছোই'। সিদ্ধ ডিম দিয়ে পোচ করার অনুরোধ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ অনুরোধটির শতভাগ সম্ভাব্যহীনতার কথা উনিও জানতেন। তবুও কেন আমাকে এ অনুরোধ?

ফিরে এলাম এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে—যে করেই হোক আমার সেক্টর কমান্ডারের ইচ্ছা পূরণ করবো, তা সে যেভাবেই হোক।

যে রাস্তাটি ময়নামতি থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যায় সে রাস্তায় ময়নামতি থেকে ১৮ কি.মি. দূরে গোমতি নদীর উপর ব্রিজ। ব্রিজের অপর পাড়ে কোম্পানিগঞ্জ বাজার। বাজার হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গেছে অসম্পূর্ণ কাঁচা রাস্তা নবীনগর। কোম্পানীগঞ্জ বাজারের শ'খানেক গজ দূরে ন্যাশনাল ব্যাংক অফ পাকিস্তানের একটি ছোট শাখা। আমার সেক্টর কমান্ডারের টাকার একমাত্র উৎস।

পাকিস্তানি ক্যাম্পটি আমরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে রেইড করবো। স্বভাবতই গুলিবর্ষণের জবাব পাকিস্তানিরা গুলি দিয়েই দেবে এবং প্রচণ্ডভাবে। আদতে রেইড নয় রেইডের একটি মহড়া হবে। উদ্দেশ্য দুইটি, এক. শত্রুর দৃষ্টি অন্যদিকে অর্থাৎ রেইডিং দলের দিকে নিয়ে যাওয়া এবং দুই. গুলির প্রচণ্ড শব্দে যেন ব্যাংক ভাঙার শব্দ পাকিস্তানিরা শুনতে না পায় রেইড দলকে ব্যাংক ভাঙার বিষয়ে কিছুই বলা হলো না। তাদের রেইড শুধু পাকিস্তানি ক্যাম্পের উপর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে বলা হলো। তার জন্য নিরাপদ অবস্থানও নির্বাচন করা হলো। বিশ্বস্ত চারজন ছেলেকে ১০ পাউন্ড করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, পাঁচটি ডেটোনেটর-২৭ এবং ১২ ফুট সেফটি ফিউজ সাথে নিলাম। এ চার সহযোদ্ধাকে ব্যাংক ভাঙার বিষয়ে কিছুই বলা হলো না। তাদের সাথে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র দেয়া হলো না। শুধু আমি একটি ৯ এম.এম সাব-মেশিন কারবাইন (ভারতীয়) এবং দুই ম্যাগাজিন ভর্তি গুলি নিলাম। সাথে একটি চার ব্যাটারী টর্চ।

এই ছিল পরিকল্পনার সংক্ষেপ। অভিজ্ঞতা ও রণাকৌশল শিক্ষার অভাবে পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি রয়েই গেলো।

সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের এক রাতে ছেলেরা শত্রু অবস্থানের উপর পরিকল্পনা অনুযায়ী গুলিবর্ষণ শুরু করলো। চার সহযোদ্ধাসহ আমি ব্যাংক বিল্ডিং-এ পৌঁছলাম পূর্ব দিক থেকে অত্যন্ত সাবধানে। আমাদের রেইডিং পার্টিরই লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি আসতে পারে। রাতের আঁধারে এ এক কঠিন সমন্বয়। সামান্য এক্সপ্লোসিভ দিয়ে কলাপসেবল গেট এবং দরজার তালাগুলো ভেঙে ফেলা হলো। এবার ভোল্ট (যে ভারি ও নিরাপদ সিন্দুকে টাকা থাকে) ভাঙার পালা। সবার বুক দুরু দুরু করছে। একটু টের পেলেই শত্রু দালানটি ঘেরাও করে ফেলবে। নির্ঘাৎ মৃত্যু। ভোল্ট এর চাবির ছিদ্রের ভিতর টিপে টিপে কিছু এক্সপ্লোসিভ ঢুকিয়ে অল্প সেফটি ফিউজ ডেটোনেটরসহ লাগিয়ে সবাই বাইরে এলাম। বিকট শব্দ হলো। গিয়ে দেখি বেশ খানিকটা লোহার সিন্দুক ভেঙে গেছে। এবার ৪০ পাউন্ডের বাকি সবটুকু এক্সপ্লোসিভ লাগালাম (এটি আটা বা ময়দার কাই এর মতো)। ভয়ের কারণ এখন। কেননা বিকট শব্দ হবে, নিশ্চিত। শত্রু শব্দের উৎস খুঁজতে পারে। আমাদের ধারণা এ প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যে শব্দ বিকট হলেও খুব কমই শোনা যাবে এবং শত্রু এটিকে আমাদের মর্টারের শেল এর আওয়াজ হিসেবে গুরুত্ব নাও দিতে পারে। এবার ডেটোনেটর লাগালাম। সেফটি ফিউজ দিলাম ৬ ফুট। অপর প্রান্তে আগুন দিলে এক মিনিটে পুড়বে ১/5

ফুট। তার অর্থ আমরা বিস্ফোরণের আগে নিরাপদ দূরত্ব যাবার জন্য ৪ মিনিট সময় পাবো।

বিকট শব্দে এলাকা কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটলো। আমরা যেভাবে কানে হাত দিয়ে বসেছিলাম মিনিটখানেক সেভাবেই বসে রইলাম। শত্রু টের পেয়ে থাকলেও ওরা কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আগেই আমাদের কাজ সমাধা করতে হবে। ব্যাংকে ঢুকে পড়ে দেখি ভোল্ট ভেঙে চারিদিকে সব টাকা ছড়িয়ে আছে। টাকা কিসে করে নেবো তার ব্যবস্থা করা হয়নি। আসলে ভাবতেই পারিনি এতো টাকা হবে। পাশে টাকা বহন করার টিনের ট্রাংক পেলাম চারটা। তাড়াতাড়ি করে তার তিনটিতে টাকা ভরলাম। তালার অভাবে আটকানো গেল না। এগুলো ভারতে সেক্টর হেডকোয়ার্টারে বহন করে নিয়ে যাবার শ্রমিক দরকার। বহু কষ্ট করে রাস্তা পার করে নবীনগর যাবার রাস্তা যেখান থেকে শুরু তার পাশে একটি ঝোপে এনে রাখলাম। দুজনকে পাঠালাম ছয়জন শ্রমিক আনতে। পরিবারকে এই আশ্বাস দিয়ে যে মুক্তিযোদ্ধাদের একটু সাহায্য করতে, পরদিনই চলে আসবে। ওরা মিনিট দশের মধ্যেই ছয়জন লোক নিয়ে এলো। ইতোমধ্যে বিস্ফোরকের শব্দে আশেপাশের গ্রামের সবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো।

আমার বয়স ১৯, তবু ১৯ মণ ওজনের দায়িত্ব আমার কাঁধে। তিন ট্রাংক টাকা এবং আমার সাথে কেবল একটি আগ্নেয়াস্ত্র। ভারতীয় বিএসএফ এবং ভারতীয়দের নজর এড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় ভয় আমার চার সহযোদ্ধা এবং ছয়জন গ্রামবাসী। কেননা কোনো ট্রাংকেরই তালা নেই, ঢাকনা খুললেই টাকা। এক মুহূর্ত অসতর্ক হবার সুযোগ নেই। নগদ টাকা বলে কথা এবং তা অ-নে-ক। সত্যি বলতে কী—এক পর্যায়ে নিজের প্রাণ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে গেলাম। যদি আমাদের ছেলেরাই আমাকে টাকার জন্য হত্যা করে। আমাদের সেক্টর হেডকোয়ার্টার মেলাঘরের দূরত্ব বেশি নয় কিন্তু পথটা বন্ধুর। মাথায় ট্রাংক নিয়ে বিশেষ করে উঁচুতে ওঠা কষ্টকর। কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিতে হতো। কাউকে কারণ ব্যাখ্যা না করলেও সূর্য ওঠার আগেই মেলাঘর পৌঁছবো এ উদ্দেশে অটল রইলাম।

ভোর হবার আগেই মেলাঘর প্রবেশ করলাম। ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়লো। রেজিমেন্টাল পুলিশ চেক পোস্টের পাশে ৩০/৪০ মিনিট জিরিয়ে নিলাম সবাই। ক্ষুধায় পেটের নাড়িভুঁড়ি সমেত হজম হয়ে যাবার উপক্রম।

পাহাড়ের উপর দু'টি ১৮০ পাউন্ড তাঁবু লম্বালম্বি করে লাগিয়ে নিচে মাটি খোদাই করে ক্যাপ্টেন হায়দার বানিয়েছেন 'অপারেশন রুম'। তিনি অপারেশন রুমের ভেতরেই ছিলেন। ট্রাংকগুলো রাখতেই উনি জানতে চাইলেন ভিতরে কী। আমি একটা ট্রাঙ্কের ঢাকনা তুললাম। এতো টাকা দেখে তিনি এক লাফে উপরে উঠে এলেন। ৫০ গজ দূরেই সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফের 'ডেরা'। মুলি বাঁশের নির্মিত তিন কামরার ঘর। আসবাবসহ সবই মুলি বাঁশের। তিনি

বারান্দায় বসে ছিলেন। তার সামনে ট্রাংকগুলো রাখতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হায়দার এগুলি কী'। 'স্যার, কামরুল এনেছে' ক্যাপ্টেন হায়দারের জবাব। বলেই একটি ট্রাংকের ঢাকনা খুললেন।

মুহূর্তেই খালেদ আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ধরেই রইলেন। অনুভব করলাম উনার আনন্দাশ্রু পড়েছে আমার পিঠে। আমি যে কিছু বলবো তখন কোনো সুযোগই রইলো না।

নোট পরে জেনেছি মরহুম মেজর. জেনারেল আবুল মনজুর, বীর উত্তমের ভাই ব্যারিস্টার আবুল মনসুর (০১৮১৭১৫৮১৪৩) মেজর খালেদ মোশারফের অনুরোধে মোট টাকার একটি অংশ ভারতীয় মুদ্রায় বদল করেছেন। ওনার সাথে আমার এ বিষয়ে কথা হয়েছে ১৪ জুলাই, ২০১৫ তারিখে রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলমের অফিসে।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া

জন্ম ২৪ জুলাই, ১৯৫২, কুমিল্লা। শিক্ষা যশোর জিলা স্কুল এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ। ১৩ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষার আঠারো দিন আগে ২৫ মার্চ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালিদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলে যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে, ২ নম্বর সেক্টরে। চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পঁচাত্তরের ১১ জানুয়ারি ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এ কমিশন লাভ করেন। ১২ জুলাই, ১৯৯৬ স্বেচ্ছায় অবসর নেন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ভাষা ও সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তার বইয়ের সংখ্যা ২৭টি, সামরিক ইতিহাসের লেখা একটি এবং শিশুতোষ গ্রন্থ ৪টি। বর্তমানে তিনি সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক।